মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

বাংলাদেশ আমার অস্তি যায় না

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

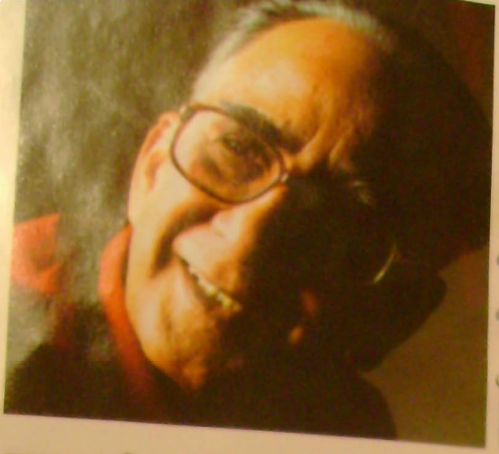

রেখাচিত্র : নাসির আলী মামুন

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এ-পর্যন্ত মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশ। বাংলা গ্রন্থগুলো–যথাশব্দ (১৯৭৪), রবীন্দ্রপ্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার (১৯৮৩), মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৩), কোরানসূত্র (১৯৮৪), গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ (১৯৮৫), বচন ও প্রবচন (১৯৮৫), রবীন্দ্ররচনার ব্যাখ্যা (১৯৮৬), রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য (১৯৮৬), আমরা কি যাবো না তাদের কাছে যারা শুধু বাংলায় কথা বলে (১৯৯৬), বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক (১৯৯৬), তেরই ভাদ্র শীতের জন্ম (১৯৯৬), আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (১৯৯৭), বাংলাদেশে সংবিধানের শব্দ ও খণ্ডবাক্য (১৯৯৭), বাংলাদেশের তারিখ (১৯৯৮), মনের আগাছা পুড়িয়ে (১৯৯৮), বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ (১৯৯৯), সরকার সংবিধান ও অধিকার (১৯৯৯), কবি তুমি নহ গুরুদেব (১৯৯৯), একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয় (১৯৯৯), মৌসুমি ভাবনা (১৯৯৯), মিত্রাক্ষর (২০০০), জাগো ওঠো দাঁড়াও বাংলাদেশ (২০০০), নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০০), কোরানশরিফ সরল বঙ্গানুবাদ (২০০০), চাওয়া-পাওয়া ও না-পাওয়ার হিসেব (২০০১), স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন ও বোবার স্বপ্ন (২০০২), রবীন্দ্ররচনায় আইনি ভাবনা (২০০২), বিষণ্ন বিষয় ও বাংলাদেশ (২০০৩), প্রথমে মাতৃভাষা পরভাষা পরে (২০০৪), সাফদেলের মহড়া (২০০৪), দায়মুক্তি (২০০৫), একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা (২০০৫), উন্নত মম শির (২০০৫) কত ভাগ্যে বাংলাদেশ, কোথায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ (২০০৬), শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতাদের জয় হোক (২০০৭)

বাংলা আজ পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা। প্রত্যেক সময়-বলয়ে উচ্চারিত হচ্ছে বাংলা। আজ বিশ্বে বাংলার সূর্য অস্ত যায় না। শুধু তাই নয়, এই গৌরব প্রতিটি বাঙালির। বাঙালির রাষ্ট্রভাষা আদায়ের আত্মত্যাগের দিন মহান ২১ ফেব্রুয়ারিও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত হয়েছে।

বাংলা ও বাঙালির তাই গর্বের সীমা নাই। এমনই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান রচনা করেছেন এই গ্রন্থ। এতে বাংলা ভাষা ও তার প্রাসঙ্গিকতা, যেমন আলোচনায় স্থান পেয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র–দেশে ও মহাদেশে বসবাসকারী বহুভাষিক জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্ত।

ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু মানুষের ভাষিক বিপন্নতার কারণ অন্বেষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এছাড়া একভাষিতা ও বহুভাষিতা, ভাষা প্রেম ও ভাষা বৈরিতা, একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিকথা, আন্তর্জাতিক ঘোষণায় ভাষার অধিকার, দেশের উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষার স্থান ইত্যাদি বিষয়ে সব মিলিয়ে বারোটি প্রবন্ধ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটি বাংলা ভাষা চর্চাকারী লেখক, পাঠক, গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন ভাবনার উদ্রেক করবে।

© লেখক
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৩
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

বর্ণবিন্যাস
বাংলাবাজার কমপিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

পরিবেশক
সুবর্ণ
১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ঢাকা ১০০০

দাম
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 524 2

BANGLAR SURJA AJ AR ASTO JAI NA (The Bangla sun does not set anywhere) by Muhammad Habibur Rahman. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover designed by Qayuum Chowdhury. Price : Taka One Hundred Fifty Only.

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ
আনা ইসলাম
ও
শাহাবুদ্দিন আহমদ-কে

ভূমিকা

আজ বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা। প্রত্যেক সময়-বলয়ে আজ বাংলা উচ্চারিত। আজ বিশ্বে বাংলার সূর্য অস্ত যায় না। সেই ভাষা ও প্রাসঙ্গিক একভাষিতা ও বহুভাষিতা, হরফ নিয়ে হুজ্জত, একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিকথা, আন্তর্জাতিক ঘোষণায় ভাষার অধিকার, দেশের উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষার স্থান ইত্যাদি বিষয়ে বারোটি প্রবন্ধ এবং দেশ-বিদেশে প্রদত্ত চারটি সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এই লেখাগুলোগত ছয় বছরে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হয়। লেখার তোড়ে অনেক সময় পুনরুক্তি ঘটেছে যা এখানে পরিহার করা হয়নি।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

ঢাকা

সূচিপত্র

একুশে ফেব্রুয়ারির সুবর্ণজয়ন্তীতে ১১
সকল ভাষার জন্য ভালোবাসা ১৮
ভাষা প্রশ্নে জিন্নাহ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ২৫
বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বায়ান্নো বছর পরে ৩০
আগরতলার বইমেলায় ৩৮
বাংলা ভাষার সূর্য অস্ত যায় না ৪৩
হরফ নিয়ে হুজ্জত ৪৭
ভাষাপ্রেম ও ভাষাবৈরিতা ৫৩
বিপন্ন ভাষা ৬৪
একভাষিতা ও বহুভাষিতা ৭৭
আন্তর্জাতিক ঘোষণায় ভাষার অধিকার ৮৫
উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষা ৯৩

পরিশিষ্ট

এখন পৃথিবীতে বাংলার সূর্য অস্ত যায় না ১১৪
সর্বস্তরে বাংলা চালুর জন্য প্রয়োজনে আইনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে ১২২
একুশ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করাটা আইনসঙ্গত ছিল না ১২৮
বিশ্বায়নের রথের তলায় ১৩৩
নির্ঘণ্ট ১৩৭

একুশে ফেব্রুয়ারির সুবর্ণজয়ন্তীতে

একুশে ফেব্রুয়ারির ডাকনাম একুশে, আদরের নাম অমর একুশে। পৃথিবীর সকল বাংলাভাষীদের ঘরে আজ এই নাম যেমন পরিচিত, একুশে ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর সকল ভাষাবিদ ও ভাষাপ্রেমিকদের কাছে আজ তেমনি পরিচিত। একুশকে ঘিরে পূর্ববাংলা নতুন রাজধানী ঢাকাকে তার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করে।

জাতিধর্মনির্বিশেষে বাংলাদেশে দিবস-পালনের আর-একটি অবশ্যপালনীয় দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশকে নিয়ে বাংলাদেশের গড়ে উঠেছে নানা শিল্প ও সংস্কৃতিকর্ম এবং গ্রন্থপ্রকাশনা ও গ্রন্থমেলা। সংগীত ও সাহিত্যে, নাটক ও চলচ্চিত্রে এবং বিবিধ চিত্র ও শিল্পকলায় একুশের অনুপ্রেরণা ও প্রভাব আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। একুশকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানান তর্কিত ও অতিরঞ্জিত কাহিনী। আবার ঢাকার একুশে মিনারের শ্রীহীন ও রুচিহীন অনুকৃতিও ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে।

ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে আমরা অনেক সময় এমন অহঙ্কার করে থাকি যেন ভাষার জন্য দুনিয়ায় আর-কেউ প্রাণত্যাগ করেনি। এরকম দাবি যথার্থ নয়। বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষার দাবিতে বহুজনে লাঞ্ছিত হয়েছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং অনেকে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। বাড়ির কাছেই ১৯মে ১৯৬১ মাতৃভাষার আন্দোলনে কাছাড়ের বাংলাভাষীদের মধ্যে ১১ জন শহীদ হন।

বাংলাভাষার আন্দোলন কোনো সময় একদর্শী, বিদ্বেষমূলক বা আগ্রাসী অবস্থান গ্রহণ করেনি। তা আত্মকেন্দ্রিক বাঙালিয়ানা দিয়ে শুরু হয়নি। পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে বাংলাভাষীদের কোনো বৈরিতা ছিল না। ফলে সিন্ধি, বালুচ ও পাখতুনভাষীরা বাংলাভাষীদের দাবির প্রতি কোনো বৈরীভাব পোষণ করত না। সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগিরষ্ঠের ভাষা বাংলা হলেও বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা দাবি করা হয়নি। যে-যুক্তিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করা হয়েছিল, সেই যুক্তিতে পাকিস্তানের অন্য সকল ভাষার প্রতি যথোপযুক্ত

মর্যাদাদানের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়। এ-ব্যাপারে সারা পৃথিবীর—কানাডা, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড প্রমুখ দ্বিভাষিক/বহুভাষিক রাষ্ট্রের—নজির উল্লেখ করা হয়েছিল। বাম-চিন্তাধারার পক্ষে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সব দলিলপত্র যে ১৬টি ভাষায় প্রকাশিত হয় তারও নজির উল্লেখ করা হয়। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির পরের বছরে সকল ভাষার সমান মর্যাদার দাবি ওঠে বাম-মহল থেকে। জনগণের দাবির সঙ্গে কিছু আপস করে ডানপন্থীর আওয়াজ তোলে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাসানো বাংলা চাই না।'

একুশে ফেব্রুয়ারির পঞ্চাশ বছর শেষ হতে চলল। গত পাঁচ দশকে দেশে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। ভাষার আন্দোলন স্বাধীন রাষ্ট্রের আন্দোলন পেরিয়ে একটা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কাগুজে স্বীকৃতি পায় ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান আমলে। ভাষা থেকে রাষ্ট্র হয়েছে। দেশের রাষ্ট্রভাষাকে জনগণের মাঝে সাক্ষরতার মাধ্যমে রাষ্ট্র করার তেমন ঐকান্তিক চেষ্টা এখনো সার্থক হয়নি। আজ পঞ্চাশ বছর পরেও আমরা সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার আওয়াজ তুলি। কারণ, সর্বস্তরে আজও রাষ্ট্রভাষা চালু হয়নি। রাষ্ট্রীয় ভোজে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান রাষ্ট্রের পক্ষে অ-রাষ্ট্রভাষায় বক্তৃতা দেন। দেশের উচ্চ বিচারালয়ে আজও অ-রাষ্ট্রভাষায় রায় দেওয়া হয়।

আজ একুশের বদৌলতে দেশের মানুষ বাংলা ব্যবহার করে সর্বত্র তার আবেদন-আর্জি-দরখাস্ত পেশ করতে পারে। বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বের সেই হীনম্মন্যতা আর নেই। তবে ইংরেজির প্রতি আমাদের মোহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি বিদ্যালয়, বিশ্ববিদালয়, বিপণি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামকরণে ইংরেজির প্রচলন দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নানান ছুতোয় বিবাহের আমন্ত্রণলিপি ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে। বরপক্ষ বা কনেপক্ষের বাপ-মাকে দোষ দিতে চাই না। পাত্র-পাত্রীর অধিকার রয়েছে তাদের বিবাহে তারা কোন ভাষায় নিমন্ত্রিতদের আমন্ত্রণ জানাবে। বিবাহের পূর্বে অভিলাষ-পূরণের চেষ্টা করা ভালো। ইংরেজি ভাষার ব্যবহারে হয়তো বিবাহ শুভ হতে পারে। ভাষার ব্যবহারে এমনকি রাষ্ট্রভাষার ব্যবহারে সর্বত্র কড়াকড়ি ব্যবস্থা চালু করে তেমন ফল পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রভাষার ব্যবহার এখনও যে সম্পূর্ণ চালু হলো না এর জন্য অন্য কাউকে দোষারোপ না করে আমাদের অপদার্থতাকে শনাক্ত করা প্রয়োজন।

একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয় এমন ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশেই প্রথম উচ্চারিত হয়। সকল ভাষার সম্মান মর্যাদার দাবি তোলা হয়। স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাভাষার প্রতি অবশ্য দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ ছিল সীমিত। ৮ জানুয়ারি ১৯৯৮ কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের জনাব রফিকুল ইসলাম জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণা দেওয়ার জন্য একটা আবেদন করেন। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সর্বসম্মতভাবে ইউনেস্কোর প্রথম ও দ্বিতীয় কমিশন বাংলাদেশের প্রস্তাব গ্রহণ করে। বাংলাদেশের সেই প্রস্তাবে ২৭টি দেশ শরিক হয়।

১৯৫২ সালের একুশে আজ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র পালিত হচ্ছে। এ-ব্যাপারে আমাদের যে অগ্রণী ভূমিকা রাখার কথা ছিল সে-কর্মতৎপরতা আমরা দেখাতে পারিনি। দেশেই পারি না, তো বিশ্বভুবনের কামেলা পোহাতে কি আমাদের মন চাইবে?

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে বাংলাদেশের প্রশাসন যে-ভূমিকা রেখেছে তার জন্য তেমন গর্ব করার কিছুই নেই। গত দু'বছর ধরে বাংলাদেশের প্রশাসন ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসসম্বলিত তথ্যাদি জাতিসংঘের ১৮৮টি দেশের কাছে পাঠাতে পারেনি। বিভিন্ন দেশ স্বীয় উদ্যোগে এ-ব্যাপারে আমাদের সরকারের কাছে তথ্যাদি চেয়ে বিফলমনোরথ হয়েছে। এ-সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেশের মানুষকেও সরবরাহ করতে প্রশাসনের তেমন উৎসাহ নেই। সাংবাদিকরা এক দরজা থেকে অন্য দরজা ঘুরে ঘুরে শিক্ষা সংস্কৃতি, তথ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তেমন কোনো ইঙ্গিত পায় না যে, সরকার দেশের বাইরে জাতিসংঘের জাতিসূহকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য কোনো উদ্যোগ নিয়েছে কি না।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর সরকার ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য, পটভূমিসংক্রান্ত তথ্যাদি ইংরেজি, স্প্যানিশ, চৈনিক, রুশ, আরবি ও জাপানি ভাষায় পুস্তিকা ও সিডি তৈরি এবং একটি ওয়েব সাইট খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। গত বছর চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সম্পর্কে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে এবং এটি ইংরেজি ভাষান্তরণ বাংলা একাডেমী সম্পন্ন করেছে বলে জানা যায়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের জন্য ১৫ মার্চ ২০০১ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান যৌথভাবে এক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইনস্টিটিউটের প্রকল্পের জন্য সাড়ে ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। একুশের সুবর্ণজয়ন্তীর উপলক্ষে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রত্যাশা করা হয়েছিল কোথাও তা দেখা যায় না। এবার ১৬ ডিসেম্বর অনাদরে পালিত হয়েছে। অনুরূপ অনীহায় একুশের সুবর্ণজয়ন্তীও যেন অবহেলিত।

রাজনৈতিক ডামাডোলে ও ক্ষমতার সংঘর্ষময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একুশের চেতনার অবস্থা ভাগের মায়ের গঙ্গা না-পাওয়ার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা শোচনীয় না হয়ে সহনশীল অবস্থায় থাকলে শুধু বাংলাভাষার উন্নয়নে নয় দেশের সর্ব উন্নয়নকর্মে অনেক বেশি আমরা অর্জন করতে পারতাম। আমাদের নিম্নমানের প্রবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় আমাদের ভাষা নয়, আমাদের রাজনৈতিক খাসলত।

গত পঞ্চাশ বছরের কালপরিক্রমায় একুশ ফেব্রুয়ারির দিন অথবা সেই দিন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়। বায়ান্নর একুশের পরের বছরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে এক অত্যন্ত সার্থক ধর্মঘট পালিত হয়। দুবছরের মধ্যে রাজনৈতিক মণ্ডলে যুক্তফ্রন্ট এক একুশদফা কর্মপন্থা গ্রহণ করে এবং মুসলিম লীগকে পর্যুদস্ত করে নির্বাচনের জগতে এক রেকর্ড সৃষ্টি করে।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৮ সামরিক শাসনকর্তা আইয়ুব খান পাকিস্তানের সব ভাষার জন্য রোমান হরফ এবং একটি সাধারণ ভাষা সৃষ্টির প্রস্তাব দেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার আগের প্রস্তাবের মতো এ-প্রস্তাবও তেমন কোনো সাড়া জাগায়নি।

যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা থেকে ছয় দফা এবং পরে এক দফায় স্বাধিকারের আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমি ঘোষণা করছি আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু হবে। বাংলাভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তার পরে বাংলাভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদরা যত খুশি গবেষণা করুন। আমরা ক্ষমতা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষা চালু করে দেব, সে-বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।'

পরে ১৯৭১ সালে দখলদার পাকিস্তান বাহিনী একুশে মিনার ভেঙে দেয়। মুজিবনগর সরকারের অনেক কাজ বাংলায় সমাধা হলেও আইনের ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার অব্যাহত থাকে। দেশে ফিরে প্রবাসী সরকার ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১ নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে—প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা দেন, বাংলা হবে দেশের সরকারি ভাষা।

আত্মশাসনের অধিকার অর্জিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ শহীদমিনার চত্বরে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সূচনা হয়। শহীদমিনারকে চর দখলের মতো রাজনৈতিক নন্দীভৃঙ্গিরা দখল করার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপ্রধানও ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রহরে তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারতেন না। দেশে সামরিক শাসনের সময় ভাষাসংক্রান্ত নানান প্রস্তাব করা হয়। সাম্প্রতিক কালে প্রায় প্রতিটি ২১ ফেব্রুয়ারিতে কেউ-না-কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। নজিরবিহীন তাণ্ডব শুরু হয় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮। জুতোপায়ে শহীদমিনারে উঠে রাষ্ট্রপতি, প্রাধানমন্ত্রী, স্পিকার ও অন্যান্যদের দেওয়া পুষ্প স্তবক পদদলিত ও লণ্ডভণ্ড করা হয়।

রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রশাসনের আওতা থেকে বিচারবিভাগকে পৃথকীকরণ বা কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে-অনীহা ও দোলাচলতা রয়েছে সর্বস্তরে রাষ্ট্রভাষা ব্যবহারের ব্যাপারেও অনুরূপ ভাব পরিলক্ষিত হয়। সব সরকারই দেশের সাধারণ মানুষের ভাবাবেগের প্রতি নজর দিয়ে আনুষ্ঠানিকতাটুকু পালন করতে অবশ্য তেমন ত্রুটি দেখায় না।

৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫ প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন বাসভবন বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন হয়। প্রশাসনে ও শিক্ষাঙ্গনে মাতৃভাষার ব্যবহার সুগম করার জন্য বাংলা একাডেমী তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে

সক্ষম হয়নি। বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের যোগানদার হিসেবে এক ব্যাপক অনুবাদকর্মে আরো বড় উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বাংলা একাডেমী অভিধান-সংকলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনায় তেমন সাফল্য লাভ করেনি। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে যে ভারসাম্য থাকা উচিত তা থাকেনি। দিবসপালনে ও আনুষ্ঠানিকতায় বহু সময় ও অর্থ ব্যয়িত হয়েছে। সাধারণ পাঠের জন্য যেসব বই প্রকাশ করা হয়েছে তার দায়িত্ব বেসরকারি উদ্যোগের জন্য ছেড়ে দেওয়া যেত।

পঞ্চাশ বছরে বাংলা একাডেমী একটি ব্যাকরণ রচনায় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তার প্রমিত বানান নিয়ে নানান আপত্তি। আমরা এক 'বাঙালি'র ছয়রকম বানান দেখি। সাধু ও চলতি বাংলা নিয়ে কোনো ঐকমত্য নেই। যে-কোনো ভাষা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো মুশকিল। হুজ্জতে বাংলাভাষীদের ক্ষেত্রে তা প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার!

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলেই মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলায় পড়া ও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পাকিস্তান আমলে উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলা চালু হয়। ডিগ্রি স্তরে বিকল্প হিসেবে স্বাধীনতার পূর্বেই বাংলার প্রচলন হয়। সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে বেশ বাংলা বই লেখা হলেও অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রকৌশল বা চিকিৎসাবিদ্যায় বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পন্ন সম্ভব হয়ে উঠল না।

প্রাথমিক পর্যায়ে কর্তার ইচ্ছায় ইংরেজি পড়ানো চালু হলেও তা কোনো সুযোগ বয়ে নিয়ে এল না। আমাদের দেশে বিদেশী ভাষা শেখার সুযোগ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিদেশী দূতাবাসের বদান্যতায়। শেখানোর গুণে অতি অল্প সময়ে বাঙালি ছেলেমেয়েরা পরভাষা শিখছে। কিন্তু আবার শেখানোর গুণেই তারা ইংরেজি ভাষা তো দূরের কথা মাতৃভাষাও ঠিকমতো রপ্ত করতে পারছে না।

পাকিস্তানের দুটো সংবিধানে ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে বাংলাকে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বিধান দেওয়া হয় যে বিশ বছর পরে সরকারিভাবে তার প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য এবং উচ্চশিক্ষায় বাংলা প্রয়োগের প্রস্তুতিকল্পে ১ জুলাই ১৯৬৩ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বর্তমানকালবাচক একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত হলো : 'প্রাজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।' বাংলাভাষার অধিকতর ব্যবহারের জন্য সরকারি পরিপত্র জারি করতে হয়েছে বারবার। অনেক সময় বিপরীত হাওয়া বয়েছে। বলা হয়েছে সরকারের উচ্চতম পর্যায়ে যেসব বিষয়ের সারসংক্ষেপ হবে তা ইংরেজিতে লিখতে হবে।

১৯৮১ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে বাংলাভাষা প্রচলন আইন পাশ করা হয়। আইনে বলা হয়, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে সরকারের কোনো

কাজে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় লেখা যাবে না। দেশের অভ্যন্তরে সরকারি কাজে কোনো কারণে ইংরেজি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বা জরুরি হয়ে দেখা দিলে বিশেষ অনুমতি বা ছাড়পত্রের জন্য 'বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ'-এর কাছে আবেদন করার ব্যবস্থা রাখা হয়। 'বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ'-এর ছাড়পত্র ছাড়া ইংরেজি ভাষায় লেখা কোনোকিছুই ছাপা যাবে না বলে সম্প্রচারিত নির্দেশ বাংলাদেশ সরকারি প্রেস পালন করে আসছে। সরকার থেকে দাবি করা হয় বর্তমানে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া প্রায় ৯০ ভাগ সরকারি কাজ বাংলায় হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্মে রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার না করার জন্য যে শৃঙ্খলাভঙ্গের অনিয়ম হয় তার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা হয়েছে বলে শোনা যায় না।

সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্ণভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে একটি ব্যক্তিগত বিল পাশ করা হয়। সেই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা হয়নি। নিচের আদলত এক মামলায় ইংরেজিতে লিখিত আপত্তি প্রত্যাখান করলে হাইকোর্ট ডিভিশন সেই আদেশ নাকচ করে দেয়। এ-ব্যাপারে দেশের শেষ বিচারালয় আপিল বিভাগের সিদ্ধান্তের জন্য সরকার, বা সংক্ষুব্ধ পক্ষ কেউ কোনো আবেদন করেনি।

দুবছর আগে হাইকোর্টের এক ডিভিশন বাংলায় একটি রায় দেয়। সেই উদ্যোগ ছিল প্রতীকীপ্রীতির এক নজির মাত্র। আইন, নজির ও রিপোর্ট ইংরেজিতে থাকলেও বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করলে শেষ বিচারালয়েও আজ বাংলা চালু হয়ে যেত। আমি বিচারকার্য থেকে অবসর নেওয়ার সময় বলি, 'দেশের জনগণ যদি চান তাঁদের সর্বোচ্চ আদালতে সব কাজ তাঁদের ভাষায় হবে, তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যতদিন না প্রয়োজনীয় আইন পাশ করছেন ততদিন বিচারকবৃন্দ স্বেচ্ছায় বাংলায় হাতেখড়ি দিতে চাইবেন না।'

ছয় বছর আগে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ 'বাংলাভাষার সংগ্রাম এখনও অসমাপ্ত' শীর্ষক এক প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম :

"দেশের আদলতে যে দ্বৈতশাসন চলছে—নিচের আদালতে বাংলা ও উপরের আদলতে ইংরেজি—তার আশু অবসান হওয়া প্রয়োজন। যতদিন না আমরা সাক্ষরতার আশীর্বাদ প্রতিটি নাগরিকের ঘরে পৌঁছে দিতে পারছি, যতদিন বকলম ও ঢেরা সহির রেওয়াজ উঠে না যাচ্ছে, যতদিন নির্বাচনের প্রতীক হিসেবে হুক্কা, ধানের শীষ বা নৌকার প্রচলন বন্ধ না হচ্ছে এবং নিচের কাঠামো থেকে সমাজের উপর কাঠামো সকল কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে সর্বোচ্চ আদালতে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে, ততদিন বাংলাভাষার সংগ্রাম আমি অসমাপ্ত বলে গণ্য করবো।

উনিশ শ' ছিয়ানব্বই ইংরেজি সালের এই অগৌরবের ফেব্রুয়ারিতে এসব কথা কে বা কারা শুনবে বা পড়বে?"

গত ছয় বছরের মধ্যে রাষ্ট্রভাষাকে তার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ আমরা নিইনি। বঙ্গভবনে রাষ্ট্রীয় ভোজে রাষ্ট্রপ্রধান বা

সরকারপ্রধান অ-রাষ্ট্রভাষা বক্তৃতা করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। দেশে এমন কথা শোনা যায় বাংলাভাষার জাতীয়করণের প্রচেষ্টার জন্যই আমরা আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নাকি পিছিয়ে যাচ্ছি। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাতীয়করণে যে-অব্যবস্থা ও দুর্দশার সূত্রপাত হয়েছিল অনুরূপ দুর্গতি ঘটবে যদি আমরা রাষ্ট্রভাষাকে প্রাধান্য দিই। ইংরেজি শেখার মাধ্যমেই আমাদের তরক্কির একমাত্র উপায়।

গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাভাষায় লেখালেখি বেড়েছে। সাহিত্যকর্মী লেখক ও প্রকাশকের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার প্রিন্টিং প্রবর্তনার পর মুদ্রণ সহজ হয়েছে। মুদ্রণপ্রমাদও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা লিপিমালা নিয়ে যে দুর্ভাবনা ছিল তা অনেকখানি দূরীভূত হয়েছে। বাংলাভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের তহবিলে অবশ্য এখনো টানাটানি। এক্ষেত্রে একটা সাদামাটা স্বচ্ছলতা অর্জন করতেও আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার দেশে ইংরেজিতে শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত অনেকে মাতৃভাষার সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। ইংরেজি ভাষায় আমাদের অবদান রাখা বেশ কঠিন।

সারা দেশের লোককে আমরা মাতৃভাষাই শেখাতে পারি না, সেখানে দেশের সকল লোককে ইংরেজি শেখাব কেমন করে? ইংরেজি ভাষার সুবিধা আমরা সাদরে গ্রহণ করব সন্দেহ নেই, কিন্তু বিদেশী ভাষা শেখার ব্যাপারে যাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদেরকে কেন আমরা মাতৃভাষায় দেশের মধ্যে সবকিছু শেখার সুযোগ এবং সর্বকর্ম সম্পাদন করার ব্যবস্থা করে দেব না। মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং তার ব্যবহার ও প্রয়োগের ব্যাপারে যেখানে আজ এক আন্তর্জাতিক সমঝোতা গড়ে উঠেছে তা পরিত্যাগ করে বিশ্বায়নের ব্যাপারীদের কাছ থেকে আমাদেরকে সবক নিতে হবে?

মাতৃভাষায় শুধু কেজো কাজে নয় সৃষ্টিধর্মী কাজেও সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি। এর কারণ এমন কিছু রহস্যময় নয়। শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে এবং প্রতিদানে শিক্ষাদান বা জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা সহজ, সুগম ও স্বাস্থ্যকর। দেহের বিকাশ ও বৃদ্ধিতে মাতৃদুগ্ধের যে-স্থান, মাতৃভাষার অনুরূপ স্থান রয়েছে মনের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে। এ-ব্যাপারে তেমন কোনো বাহাসের অবকাশ নেই। এটা বাঙালিয়ানা নয়, একথা কেবল বাঙালিদেরও নয়। একথা সেইসব বিদগ্ধ ভাষাবিদদের যাঁরা অনেক মমতায় আজ পৃথিবীর সব বিপন্ন ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন এবং মুমূর্ষু ভাষার অন্তিম ইচ্ছার দলিল তৈরির কাজে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছেন।

প্রথম আলো ০৯ ফাল্গুন ১৪০৮/২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

সকল ভাষার জন্য ভালোবাসা

আ মরি বাংলা ভাষা : এই চারটি কথা বড় ভালোবাসার কথা। নিজের মাতৃভাষাকে প্রায় সকলেই এমনি করে ভালোবেসে থাকে। খুব কম লোকে বলবে, 'আমাদের ভাষাটা মোটেই কাজের নয়, সব কথা তেমন প্রকাশ করা যায় না এবং এর সংস্কার ও উন্নতি বিধান করা একান্ত প্রয়োজন।'

এক মনুষ্যসমাজের অপর মনুষ্যসমাজের প্রতি যেমন একটা আকর্ষণ থাকে তেমনি বিকর্ষণও থাকে। একদিকে পরদেশী প্রেম পরকীয়া প্রেমের মতো দারুণ আকর্ষণীয়। আবার অন্যদিকে বিদেশীভীতি পরদেশীদের সম্পর্কে নানা ধরনের বৈরীভাবের জন্ম দেয়।

সাধারণত মানুষ পরভাষাকে পরসংস্কৃতির মতো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং পরভাষীদের জন্য নানারকম নামকরণ করে থাকে। অবাঙালিদের আমরা যখন উড়ে, মেড়ো, বিহারি, খোট্টা, কাবলি বা পাকিস্তানি বলি তখন তার মধ্যে একধরনের বিরাগ প্রচ্ছন্ন থাকে। মুসলমানদেরকে যখন হিন্দুরা যবন বা নেড়ে বলে বা মুসলমানরা যখন হিন্দুদেরকে কাফের বা মালাউন বলে তখনও একধরনের বিরাগ প্রকাশ পায়। ইউরোপে ফরাসিরা জার্মানদের হুন বলে। ফরাসিরা জার্মানদের কাছে তেলাচোরা। একজন চেকের কাছে একজন হাঙ্গেরিয়ান দুষ্টব্রণ। ফরাসিদের কাছে স্পেনীয়রা হচ্ছে উকুন।

ভাষার প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের বিষয়ে পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমরা অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্য শুনে থাকি। রবার্ট বার্চফিল্ড তাঁর *দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ* গ্রন্থে বলছেন, 'মেধাশক্তি ও বিনোদনের উৎস হিসেবে সমগ্র ইংরেজি গদ্যরচনার সমকক্ষ হয়তো পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।' চীন, জার্মানি বা রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করলে বার্চফিল্ড কি অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেন তাঁর মাতৃভাষার ব্যাপারে? চীনারা বলবে তাদের ভাষা গত আড়াই হাজার বছরে

অপরিবর্তিত রয়েছে এবং বিদ্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তার আসন আজও অটল। চীনারা গত আড়াই হাজার বছরের সাহিত্য গতকালকার খবরের কাগজের মতো পড়তে পারে। কনফুসিয়াস এখন হাজির হলে তাঁর উচ্চারণ হয়তো প্রাচীন চীনা ভাষার পণ্ডিতদের ছাড়া অন্যদের পক্ষে বোঝা মুশকিল হবে, কিন্তু লেখ্য চীনা ভাষার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য জানাতে বা বাজারে গিয়ে স্বচ্ছন্দে কেনাকাটা করতে পারবেন। চীনা ভাষা জাপানি, কোরিয়ান ও ভিয়েতনামের ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

একটি ভাষার নৈপুণ্য বা গুণ বিচার করার জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো মানমাত্রা বা মানাদর্শ আছে কি না সন্দেহ। এর কারণ তো এই যে প্রতিটি ভাষাই অনন্য।

স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস বলেছিলেন, কথা বলার জন্য বণিক-বেপারিদের সঙ্গে ইংরেজি, সৈনিকদের সঙ্গে জার্মান, মহিলাদের সঙ্গে ফরাসি, বন্ধুদের সঙ্গে ইতালিয়ান এবং ঈশ্বরের সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষা।

হিব্রুকে একসময় মনে করা হতো সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা। ১ হাজার বছরেরও ওপর ধর্ম ও শিক্ষার ভাষা ছিল লাতিন। সংস্কৃতকে দেবভাষা বলা হতো। অনেকে ভাবেন আরবি স্বর্গের ভাষা। প্রাচীন গ্রিকরা ভাবত তাদের গ্রিক ভাষা ছাড়া সব ভাষা বর্বরের ভাষা।

বিভিন্ন দেশে নানা কারণে একাধিক ভাষার প্রচলন রয়েছে। আমরা বাঙালিরা বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও ধর্মপালনের ক্ষেত্রে আরবি, সংস্কৃত ও পালি ব্যবহার করে থাকি।

লুক্সেমবুর্গে স্কুলে ফরাসি খবরের কাগজ পড়তে জার্মান এবং ঘরে লুক্সেমবুর্গিশ বলে জার্মান উপভাষা ব্যবহার করা হয়। প্যারাগুয়েতে সাধারণত লোকে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় স্প্যানিশ ভাষায় কিন্তু ঠাট্টা-মশকরা করে স্থানীয় আমেরিন্ডিয়ান গুয়ারানি ভাষায়। বাংলাদেশের অবাঙালি জনগোষ্ঠী ঘরে নিজেদের ভাষায় কথা বলে এবং কোথাও কোথাও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে।

গ্রিসে বহু দিন ধরে একসময় স্কুলে যে Katharevousa ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো, তা দেশের কোথাও কেউ আর বলে না। সাধারণ লোকের ভাষা ছিল Dhimotiki, যাকে ভদ্রভাষা বলা হতো না। যখন সেই অন্ত্যজ বা অর্বাচীন ভাষায় গুল্ড টেস্টামেন্ট অনুবাদ করা হয়, তখন গ্রিসে দাঙ্গা বেধে যায়।

যেখানে দুটো ভাষা সরকারি কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষাঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় সেখানে ভাষা নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। যেখানে দুটো ভাষা সমানভাবে প্রচলিত সেখানে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন বেলজিয়ামে অনেক শহরের দুটো নাম : একটি ফরাসিদের কাছে এবং অন্যটি ডাচদের কাছে পরিচিত। ভাষা নিয়ে অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব চলেছে বেলজিয়াম ও কানাডায়। ভাষার জন্য সরকারের পতন ঘটেছে এমন নজির রয়েছে বেলজিয়ামে।

কোনো ভাষাকে নিম্নতর বা উচ্চতর বা আদিম বা বিদগ্ধ বলা যাবে না। কোনো ভাষা বা উপভাষাকে অপর একটা ভাষার চেয়ে ভালো বা মন্দ বলা যায় না। প্রত্যেকটির রয়েছে ভাষার এক-একটি অনন্য ভাষা-পরিবেশ। প্রত্যেকটি ভাষাই অনন্য ও বিদগ্ধ। প্রত্যেকে ভাষার ব্যাপারে এক মূল্যবোধে বিশ্বাস করে না। জীববিশ্বের যেমন ভাষাতেও তেমনি সারাক্ষণ পরিবর্তন ঘটছে।

ফরাসিরা বলে যা পরিষ্কার বা বিশদ নয় তা ফরাসি নয়। জার্মানদের ধারণা, জার্মান ভাষায় একধরনের অন্তর্নিহিত মরমি শক্তি আছে যার জন্য তাদের ভাষা এত পরিষ্কার। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে একসময় জার্মান ভাষার বেশ চল ছিল। সেই অঞ্চলে নতুন প্রজন্ম জার্মানের পরিবর্তে ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করছে। ইতালিয়ানরা তাদের ভাষার সংগীত নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতে পারে।

ভাষার আত্মীকরণে যাঁরা নিবেদিত তাঁরা মনে করেন দেশের প্রধান বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা সকলের শেখা উচিত। ঘরে কেউ অন্য ভাষায় কথা বললে বলুক। ফ্রান্স এই নীতির বড় কট্টর প্রবক্তা। মেসিডোনিয়ায় একসময় গ্রিককিকরণ করা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার রুশিকরণ প্রকাশ্যে অনুসৃত হতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক অভিবাসীকে ইংরেজি ভাষায় আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'কেবল ইংরেজি'র জন্য ফেডারেল পর্যায়ে আইন পাশ করার চেষ্টা এখনো সফল হয়নি। কানাডার কুইবেক প্রদেশের কেবল ফরাসি ভাষায় আইন কানাডার সর্বোচ্চ আদালত বাতিল করে দেয়। কানাডিয়ান চার্টারের ১৬ (১) ধারাবলে কানাডার সরকারি ভাষা ইংরেজি ও ফরাসি। উভয় ভাষা সমান মর্যাদা, সমান অধিকার ও সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে কানাডার সরকার বেশ যত্নবান।

ভাষার প্রতি মানুষের অনুরাগ এমনই গভীর যে, ভাষার ব্যবহারে সামান্য পরিবর্তনের কথা উঠলে তুলকালাম সৃষ্টি হয়। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নরওয়ে, কানাডা ও বেলজিয়ামে এমন অবস্থা আমরা লক্ষ করেছি। কোনো একটি ভাষার প্রতি অনুরাগ অত্যন্ত গভীর হলেও বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে যোগাযোগের ভাষার জন্য অনেক দেশ বিদেশী ভাষার দ্বারস্থ হয়েছে। বহুভাষী ভারতের পক্ষে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা রাখা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য সেদেশে কোনো ক্ষোভের প্রতিকারের জন্য রাজ্যে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের যে-কোনো একটিতে যে-কোনো ব্যক্তির নিবেদন বা দরখাস্ত করার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

ভারত, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও পাপুয়া নিউগিনিতে ইংরেজি ভাষা প্রায় আত্মীকৃত। মালয়েশিয়া অনন্যোপায় এখনো ইংরেজি ভাষায় কাজকর্ম করছে, যদিও সেদেশে বাহাসা মালয়েশিয়াকে সর্বত্র রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পনাটি রয়েছে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃত হলেও দেশের

সর্বোচ্চ আদালতে ইংরেজি চলছে এবং কাজেকর্মে, শিক্ষায় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজির বেশ চল রয়েছে। আজকাল পারিভাষিক সমস্যাকে তুলনামূলক সহজ করার জন্য প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলাভাষায় আত্মীকৃত হচ্ছে।

ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগের জন্য সম্প্রতি বেশ কিছু ভাষার পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ ঘটেছে। ইন্দোনেশিয়ায় বাহাসা ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া নিউগিনিতে নিওমেলানেশিয়া, ফিলিপাইনে তাগালোগ, পেরুতে কেচুয়া ও ইসরায়েলে হিব্রু ভাষার নবায়ন ঘটেছে। ইহুদিদের মতো উদ্যোগ, উৎসাহ ও তৎপরতা না থাকার জন্য ভারতে সর্বভারতীয় ভাষারূপে কেউ-কেউ সংস্কৃতের কথা উত্থাপন করলেও তার কোনো অগ্রগতি হয়নি। উত্তরভারত এবং দক্ষিণভারতেরও কিছু-কিছু ভাষা সংস্কৃত ভাষা দ্বারা সমৃদ্ধ। কৌলীন্য থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা আজ মৃতপ্রায় এবং তার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত। আর্যদের সংস্কৃতপ্রেম এমনই উগ্র ছিল যে, কোনো শূদ্র সেই ভাষা শ্রবণ করলে তার কর্ণমূলে সিসা ঢেলে তাকে শাস্তি দেওয়ার নাকি বিধান প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবাদী ধর্মের ভাষা ছিল ভার্নাকুলার বা দেশী ভাষা।

আজকাল মার্কিন ইংরেজি ব্রিটিশ ইংরেজির চেয়ে চার গুণ বেশি লোকে ব্যবহার করে। মার্কিন ইংরেজি আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা, ব্রিটিশ ইংরেজি নয়। আমেরিকান ও ব্রিটিশ উভয়েই নিজেদের উচ্চারণ ও শব্দসমাহার সম্পর্কে সচেতন। পরস্পরের ভাষার তুলনা ও প্রতিতুলনায় উভয়েই সরব। বেশির ভাগ আমেরিকান ভাবে যে, ব্রিটিশ ইংরেজি উচ্চারণ বাগাড়ম্বরপূর্ণ, উচ্চনাদী এবং উন্নাসিক। বেশির ভাগ ইংরেজ ভাবে যে, মার্কিনিদের ইংরেজি উচ্চারণ মোটাবুদ্ধি হাঁদারামদের মতো।

আজ লন্ডন শহরের ছেলেমেয়েরা ৩০৭টি ভাষায় কথা বলে। বিভিন্ন ভাষার এই সহাবস্থানকে লন্ডনের কর্তৃপক্ষ স্বাগত জানিয়ে বহুভাষিতাকে সমর্থন করেছে। মানবসমাজে প্রতিবছর কিছু ভাষার মৃত্যু হচ্ছে। বহুভাষিতার উত্তরাধিকার কীভাবে অক্ষুণ্ন রাখা যায় সে নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের আজ একটা বড় চিন্তা। অনেকে মনে করেন একভাষিতা নিরক্ষরতার মতোই আর-এক ধরনের মন্দ যা বৈচিত্র্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এজরা পৌন্ড একবার বলেছিলেন, 'মানুষের সমগ্র প্রজ্ঞা একটি ভাষায় আবৃত নেই এবং মানুষের সব ধরন ও মাত্রার উপলব্ধি প্রকাশ করার ক্ষমতা একটি ভাষার নেই।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পূর্বের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটা ভাষাভিত্তিক পুনরুজ্জীবন ঘটে। আর্মেনিয়া, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং ইউক্রেনে মাতৃভাষার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়। মধ্য-এশিয়া আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান পূর্বের রুশ প্রভুদের সিরিলিক বর্ণমালা ত্যাগ করে তুর্কি জ্ঞাতিগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত পশ্চিমা বর্ণলিপি গ্রহণ করে। তাজিকিস্তান আরবি বর্ণমালা বেছে নেয়।

পূর্বের যুগোস্লাভিয়ার সার্বরা তাদের সার্ব-ক্রোয়েশিয়ান ভাষাকে শুধু সার্ব ভাষা বলতে শুরু করে এবং রুশ জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের সিরিলিক বর্ণমালা গ্রহণ করে। ক্রোটরা তাদের ভাষাকে শুধু ক্রোয়েশিয়ান বলতে শুরু করে এবং তুর্কি ও বিদেশী শব্দ বিতাড়ন করার জন্য এক শুদ্ধি আন্দোলনে তৎপরতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে বসনিয়ানরা তাদের ভাষায় আরবি ও তুর্কিভাষার শব্দকে আত্মীকৃত করার চেষ্টা করে।

ভাষার সংঘাত পরিহার করার জন্য চেকোস্লোভাকিয়া চেক ও স্লোভাকিয়া দুটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত হয়েছে। তুর্কি ভাষা থেকে আরবি ও ফারসি শব্দকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে শুদ্ধ তুর্কি ভাষা নির্মাণের জন্য সূর্য-ভাষাতত্ত্বের অবতারণা করেন কামাল আতাতুর্ক। যখন আরবি-ফারসি শব্দ অপরিহার্যভাবে তুর্কি ভাষায় রয়ে গেল তখন বলা হলো সূর্য-ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী তুর্কি হচ্ছে মানবসমাজের আদিতম ভাষা এবং যেসব অপরিহার্য বিদেশী শব্দ তুর্কি ভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো মূলে তুর্কি ছিল। ভাষা-প্রেম ও ভাষা-বৈরিতার নানান রূপ আমরা লক্ষ করেছি গত একশ বছর ধরে।

ভাষাবিদ অধ্যাপক জোশুয়া এ ফিশম্যান মনে করেন, লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা বা বৃহত্তর যোগাযোগের ভাষা হিসেবে একটি ভাষার গ্রহণযোগ্যতা তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন সে-ভাষাটি কোনো-একটি বিশেষ গোষ্ঠী, ধর্ম বা ভাবাদর্শের সঙ্গে একাত্মতায় একাকার না হয়ে যায়। আকাডিয়ান, আরামেইক এবং লাতিনের মতো সম্প্রতি ইংরেজি ভাষা আজ কোনো জনজাতির সঙ্গে তেমন সম্পৃক্ত নেই। ইংরেজি ভাষার জন্য একটি তুলনামূলক সৌভাগ্য যে, একটি অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে তার ব্রিটিশ বা মার্কিন উৎসমূলকে জনগোষ্ঠী বা ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয় না।

স্যামুয়েল পি হান্টিংটন তাঁর *দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলিজেশন অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড অর্ডার*-এ বলছেন, যেমন খ্রিষ্টিয়ান বর্ষপঞ্জি সময়, আরবি সংখ্যাগণনা এবং মেট্রিক পদ্ধতি বিশ্বের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিমাপের পন্থা তেমনি ইংরেজি আজ পৃথিবীর আন্তর্সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ইংরেজি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সত্তাকে মেনে নেয়।

ভাষা এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্য বিলোপ করার জন্য নয় বরং তার মোকাবিলার জন্য লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কার জন্ম। এটি একটি যোগাযোগের যন্ত্র এবং এটি স্বারূপ্য এবং সমাজের উৎস নয়।

ইংরেজিভাষীর সংখ্যা পৃথিবীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন কথা জোর করে বলা যাবে না। কিন্তু এটা বলা যাবে যে পৃথিবীর ৯২ শতাংশ মানুষ ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে না। আমাদের দেশের ইংরেজিপ্রেমিকদের স্থানীয় ভাষা সম্পর্কে অধ্যাপক ফিশম্যানের বক্তব্যকে স্মরণ রাখার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, 'স্থানীয় ভাষা উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষাঙ্গনের সাফল্য, স্থানীয় সরকারের অধিকতর অংশগ্রহণ,

অধিকতর শীলিত নাগরিকত্ব এবং স্বীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও বিশ্বাস সম্পর্কে আরো ভালো করে জানার ক্ষেত্রে বড় সহায়ক।'

স্বারূপ্যের ভূমিকায় ভাষার যে-গুরুত্ব, স্থানীয় ভাষার ওপর বিশ্বের বাস্তব নির্ভরতাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ফিশম্যান অবশ্য আরো বলছেন, আঞ্চলিকতা ও বিশ্বায়নের দাবি এই যে স্থানীয় ভাষায় যাঁরা কথা বলেন এবং লেখাপড়া করেন তাঁদের মধ্য থেকে আরো বেশি বেশি লোককে বহুভাষী হতে হবে। ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত ও স্টিফেন এ উওরম্ কর্তৃক সম্পাদিত আটলাস অব দ্য ওয়ার্ল্ড'স ল্যাঙ্গুয়েজেজ ইন ডেনজার অব ডিসেপিয়ারেন্স (বিশ্বের বিপন্ন ভাষার মানচিত্র)-এ বলা হয় যে, বিভিন্ন কারণ ও ঘটনাপ্রবাহে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ভাষার দুর্ভাগ্য সৃষ্টি হয়। ভৌগোলিক আবিষ্কার পর্তুগিজ, স্প্যানিয়ার্ড, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসি এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন আগ্রাসী তৎপরতা এবং গুটি বসন্তের মতো মহামারি উত্তর আমেরিকা, সাইবেরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। স্থানীয় অধিবাসীরা বেধড়ক নিপীড়িত হয় এবং তাদের সঙ্গে তাদের ভাষাও সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়। গত তিনশো বছরে কয়েকশো ভাষা হারিয়ে গেছে। এক হিসেবে পৃথিবীর প্রায় ছয় হাজার ভাষার মধ্যে প্রায় অর্ধেকসংখ্যক ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। আর-এক হিসেবে বলা হচ্ছে প্রতি দুসপ্তাহে একটি ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

ভাষার বিলুপ্তির ব্যাপারে দুটো মত রয়েছে। একটা মত হচ্ছে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য, বিভিন্ন ভাষা একই জিনিস বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকে এবং একটি ভাষার বিলুপ্তি মানবসমাজে এমন গুরুতর কোনো ক্ষতিসাধন করে না। অপর মতটি হচ্ছে বিভিন্ন ভাষা আমাদের বহুমুখী বাস্তবতাকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকে। প্রত্যেকটি ভাষার একটি নিজস্ব বিশ্ব-ধারণা রয়েছে; ভাষার বৈচিত্র্য আমাদের এক অমূল্য ধন এবং উন্নয়নের পথে একে বিঘ্ন হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। বলতে কি কোনো আদিম বা অনুন্নত ভাষা বলে কিছু নেই। প্রত্যেকটি ভাষা বিদগ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটা ভাষাকে অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করে অবজ্ঞা করা যায় না। গত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শেষোক্ত মতটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিবিধ আন্তর্জাতিক দলিলাদিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৯২ সালের জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের অধিকারের ঘোষণায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং তাদের স্বারূপ্যের উন্নয়নের জন্য তৎপর হবে এবং তার জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন বা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯৯৫ সালের আদিবাসীদের অধিকারসমূহের খসড়া ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধিতে যে-অবদান রাখে তা মানবজাতির এক সাধারণ উত্তরাধিকার। ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও

রাজনৈতিক অধিকার অঙ্গীকার চুক্তির ২৭ ধারায় বলা হয়েছে, যেসব রাষ্ট্রে জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু রয়েছে সেইসব সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা যেন তাদের সংস্কৃতি উপভোগের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মের অবলম্বন পালনে বা প্রচারে বা তাদের ভাষার ব্যবহারে বঞ্চিত না হয়।

বাংলাদেশের একটি প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের স্মরণে ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে নির্দিষ্ট করা হয়। ওই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচজন ছাত্র মৃত্যুবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। একটি শান্তির সংস্কৃতি কেবলমাত্র তখনই গড়ে উঠতে পারে, যখন জনগণ তাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় তাদের মাতৃভাষাকে সম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার অধিকার ভোগ করতে পারবে। বর্তমানে মানবাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে পরধর্ম ও পরভাষার প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন। সকল ভাষার প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে আজ আমরা সমস্বরে একবাক্যে ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলব যে, 'ভাষার নীহারিকাপুঞ্জের প্রতিটি বর্ণ এক-একটি উজ্জ্বল তারকা।'

প্রথম আলো ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

ভাষাপ্রশ্নে জিন্নাহ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ

ভাষার ব্যাপারে মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বা শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি বিবিধ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮)—উপমহাদেশের এই তিনজন প্রভাবশালী ব্যক্তির আকর্ষণীয় বক্তব্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক রচনায় মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। মাতৃভাষা তাঁর কাছে মাতৃদুগ্ধের মতো স্বাস্থ্যদায়ক। মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁর কথা ইংরেজির মতো বিদেশী ভাষা এদেশের জনসাধারণ কোনো দিন সহজে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর সেই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আলো প্রতিটি ঘরে পৌছানো যাবে না। তবে রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার করে বলেছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। ১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে মাতৃভাষা ও ইংরেজির সম্পর্কে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে : স্যার রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে দক্ষতার সাথে সর্বত্র শিক্ষা দিতে হবে, তবে স্কুলে (কলেজেও ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি মান পর্যন্ত) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। তাঁর এই বিশ্বাসের চারটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের গভীরতম শিক্ষা লাভ করে। দ্বিতীয়ত উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের সবাই যে ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে তা নয়। তৃতীয়ত ইংরেজি ভাষা শিখেও অনেকে ওই ভাষায় সত্যিকারের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। একজন মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও পর্যবেক্ষণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে-শক্তি লাগে তা অন্য একটি কঠিন ভাষা শিখতেই নিঃশেষ করে ফেলে। চতুর্থত মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়া প্রশিক্ষণ মেয়েদের শিক্ষার ভার লাঘব করবে। যাঁদের গভীরতর সংস্কৃতি ভারতের জন্য ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

তিনি মনে করেন ব্যাপক শিক্ষার বিকিরণের মধ্য দিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল বিষয়গুলো সকল বাঙালি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, তবে স্কুলে দেশী ভাষার অধিকতর ব্যবহারের দ্বারাই এটা কেবল সম্ভব।

ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সর্বত্র শিক্ষা দিতে হবে দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর মতে, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে ইংরেজিশিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। তবে তিনি পরিষ্কার করে বলেন, দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র। কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।

রবীন্দ্রনাথের নিকট জাতীয়তাবাদ ছিল একটা ভৌগোলিক অপদেবতার মতো। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য সব দরজা-জানালা খুলে রাখতে চান। অসহযোগ আন্দোলনের সময় জগদানন্দ রায়কে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে বলেন, "যে মানুষ নিজের বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে তুলে দেওয়াল গাঁথা শুরু করে, সে যে নিজের বাড়িকে ভালোবাসে এ কথা মিথ্যা। ... সেদিন যখন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ করো, সেইদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেওয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজে কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে করছি—আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করতে বসেছি—এ কথা ভুলছি, যে-সব দুর্দান্ত জাতি পরকে আঘাত ক'রে বড় হতে চায় তারাও যেমন বিধাতার ত্যাজ্য, তেমনি যারা পরকে বর্জন ক'রে স্বেচ্ছাপূর্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও তেমনি বিধাতার ত্যাজ্য।"

এই পত্রের প্রতি গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি কোনো প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ না করে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লেখেন, 'আমি চাই যত অবারিতভাবে সম্ভব সমস্ত দেশের সংস্কৃতি আমার বাড়ির চারপাশে প্রবাহিত হোক। কিন্তু কেউ আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, তা আমি কিছুতেই মানব না। একজন জবরদখলদার, একজন ভিক্ষুক অথবা একজন ক্রীতদাস রূপে আমি অন্যদের গৃহে বসবাস করতে চাই না। ভুয়া অহমিকা অথবা সন্দেহজনক সামাজিক ইজ্জতের দরুন আমি আমার ভগিনীদের উপর ইংরেজি শিক্ষার জন্য অপ্রয়োজনীয় জবরদস্তি চালাতে চাই না। আমি চাইব আমাদের সাহিত্যরসিক সমস্ত যুবক-যুবতী তাদের ইচ্ছামত ইংরেজী এবং বিশ্বের অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষা শিক্ষা করুন এবং এও আমার প্রত্যাশা যে, একজন বসুর (জগদীশচন্দ্র) মতো, একজন রায়ের (প্রফুল্লচন্দ্র) মতো, অথবা স্বয়ং কবির মতো তাঁরা তাঁদের শিক্ষার ফসল ভারতবর্ষ ও সারা বিশ্বকে দান করবেন। কিন্তু আমি চাইব না কোন একজনও ভারতীয় তার মাতৃভাষা ভুলে যাক, বা অবজ্ঞা করুক, বা তজ্জন্য লজ্জাবোধ করুক; অথবা তাদের সর্বোত্তম ভাবনারাশি মাতৃভাষায় চিন্তা অথবা প্রকাশ করতে তারা অপারগ, এমন ভাবনায় তারা উদ্বুদ্ধ হোক এও আমি চাইব না।'

গান্ধী মনে করতেন নিজের মাতৃভাষাকে ছোট করা মানে নিজের মাকে ছোট করা। ভারতের গৌরব প্রকাশে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দেরকে ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের কথা বলেন যখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলেন বা লেখালেখি করেন। যে-কোনো জাতি নিজের স্বাতন্ত্র্যকে মূল্য দিলে নিজের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে এবং তা নিয়ে গৌরব করতে হবে। গান্ধী তাঁর প্রথম প্রধান বই হিন্দ স্বরাজ হিন্দিতে লেখেন।

অল ইন্ডিয়া কমন স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড কমন ল্যাংগুয়েজ কনফারেন্সে গান্ধী হিন্দিকে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য জোর দেন। তিনি বলেন, যখন তিনি ইংরেজি বলেন, তখন তাঁর মনে হয় 'আমি একটা পাপ করছি।' এ-ধরনের পাপবোধ রবীন্দ্রনাথ বা জিন্নাহর ছিল না।

ভারতীয় ঐক্যের প্রশ্নটা বরাবরই বেশ প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। ১৩৩০ সালে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালি যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত তবে আজকে হয়তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু ভাষা জিনিসের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হলে সে বন্ধ্যা হয়।'

তিনি আরো বললেন, 'আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি, তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।'

যখন ভারতীয় মাতৃক্রোড়ের জন্য হিন্দির সুপারিশ করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথকে হিন্দিবিরোধী অভিমত প্রকাশ করার অনুরোধ করা হলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি।

তিনি ১৩৩০ সালে সভাপতির ভাষণে বলেন, 'ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু যদি বাহ্য বহনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শত্রুতা। কারণ সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন, অথবা শৃঙ্খলার মিলনমাত্র।'

হিন্দি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আদর্শ

রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি। প্রাচীন হিন্দি কবিদের এমন-সকল গান তাঁর কাছে শুনেছি যা শুনে মনে হয় সেগুলি যেন আধুনিক যুগের। তার মানে হচ্ছে, যে-কাব্য সত্য তা চিরকালই আধুনিক। আমি বুঝলুম, যে-হিন্দিভাষার ক্ষেত্রে ভাবের এমন সোনার ফসল ফলেছে সে-ভাষা যদি কিছুদিন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকে, তবু তার স্বাভাবিক উর্বরতা মরতে পারে না; সেখানে আবার চাষের সুদিন আসবে এবং পৌষ মাসে নবান্ন-উৎসব ঘটবে। এমনি করে এক সময় আমার বন্ধুর সাহায্যে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার যোগ স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে সেই শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি যেন আমাদের সাধনার বিষয় হয়। মা বিদ্বিষাবহৈ।'

১৯২৭ হিন্দিসাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'হিন্দিভাষা ভাবী রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষিত হচ্ছে। রাষ্ট্রভাষা কেবল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তায় সিদ্ধ হয় না, সাহিত্যের দিকে তার উপযোগিতা দেখাতে হবে। ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কেবল সাহিত্যের দাবি পূরণ করে মেটানো যায়।'

১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে উর্দুকে ভারতের মুসলমানদের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির জন্য একটা প্রস্তাব পেশ করা হয়। বঙ্গপ্রদেশের প্রতিনিধিরা জোর আপত্তি তোলেন। জিন্নাহর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে অবশেষে প্রস্তাবটি পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, 'যেখানে উর্দু একটি অঞ্চলের ভাষা সেখানে উর্দুর নির্বাধ উন্নয়ন ও ব্যবহার বহাল থাকবে এবং যেখানে তা প্রধান ভাষা নয় সেখানে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে উর্দু শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ ভারতের গুজরাতের হরিপুরাতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, 'জাতীয় সংহতির জন্য আমাদেরকে আমাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ও একটি সাধারণ বর্ণমালার উন্নতি বিধান করতে হবে ... আমি মনে করি হিন্দি ও উর্দুর মধ্যকার পার্থক্য কৃত্রিম। সবচেয়ে স্বাভাবিক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হতে হবে ওই দুইয়ের মিশ্রণ যেভাবে দৈনন্দিন জীবনে দেশের বৃহৎ অংশে কথা বলা হয় এবং এই সাধারণ ভাষা নাগরী ও উর্দু দুই লিপিতেই লেখা যেতে পারে।'

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ পূর্বাশার সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক চিঠিতে বলেন, 'কংগ্রেস সভাপতি হিন্দিকেই রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বাঙালীর কি দুঃখিত হবার কারণ নেই? বহুসমৃদ্ধ বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হল কোন্ অপরাধে? এ বিষয়ে আপনার অভিমত প্রার্থনা করি।'

ওই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলা ভাষাকে কংগ্রেস যদি বিশ্বভারতের রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য না করে—তা হলে এ নিয়ে আমি আপত্তি করতে পারব না। কংগ্রেসের কর্তব্য কংগ্রেসের হাতে। আমি সভ্যশ্রেণীতেও

নেই।—তোমরা যদি বৃথা চেষ্টা করতে চাও কোরো—তোমাদের বয়স অল্প, যথেষ্ট সময় আছে।' (সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্রসংখ্যা-৬, ১৬, চিঠিপত্র, খ. ২৩০)

বাংলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। প্রত্যন্ত এক প্রদেশের ভাষাকে 'বিশ্বভারতে'র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে তাঁর তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না।

জিন্নাহ ও গান্ধী উভয়েই বলেছিলেন যে, প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে গান্ধী হিন্দির এবং পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে জিন্নাহ উর্দুর জন্য ওকালতি করেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পাকাপোক্তভাবে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কালে কংগ্রেস হিন্দিকে এবং মুসলিম লীগ উর্দুর সুপারিশ করা শুরু করে। এই ব্যাপারটা বেশ গভীরে পৌঁছেছিল। তাই জিন্নাহ যখন বললেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'—তখন তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতায় জিন্নাহ আশ্চর্যান্বিত হন। ভাষার ব্যাপারে জিন্নাহর তেমন কোনো ভাবাবেগ ছিল না। তিনি তাঁর মাতৃভাষায় তেমন কোনো দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করেননি। কেজো লোক জিন্নাহর কাছে গ্র্যাজুয়েটের চেয়ে টাইপিস্টের মূল্য বেশি ছিল। ভাষার ব্যাপারেও তিনি মনে করেন, তিনি তাঁর সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করেছেন যখন জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তিনি উর্দুর জন্য সুপারিশ করেন।

ভারতের সংবিধানের ৩৪৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি হচ্ছে সরকারি ভাষা। সংবিধান প্রবর্তনার ১৫ বছরের মধ্যে ইংরেজির জায়গায় হিন্দিকে প্রতিস্থাপিত করার যে কথা ছিল তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। সরকারি আইনে ও দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ইংরেজি ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যেক রাজ্য অবশ্য রাজ্যের কর্মকাণ্ডের জন্য নিজস্ব সরকারি ভাষা নির্বাচন করতে পারে। যে-কোনো সংক্ষুব্ধ নাগরিক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের যে-কোনোটির মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও পরবর্তী ২০ বছর অফিসে ইংরেজির চালু রাখার বিধান থাকে। ১৯৬২ সালের সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বলা হয় ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন নিয়োগ করবেন সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি সরানোর ব্যাপারটা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয় 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। দেশে আইন বাংলা ভাষায় প্রণীত হচ্ছে। উচ্চ আদালতে এখনো ইংরেজির ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। আমরা প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারির দিন সারা দেশে সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের অঙ্গীকার করে থাকি। সেই অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে আমাদের তেমন কোনো চাড় নাই।

প্রথম আলো ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বায়ান্নো বছর পরে

বায়ান্নো বছর অনেক সময়—দুই প্রজন্মের কম, তিন যুগের বেশি। পাঁচ দশক এক দীর্ঘকাল। সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা কী পরিবর্তন দেখেছি? আমাদের চিন্তাধারা বা মনের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি? আমরা যদি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথা চিন্তা করি, তা হলে দেখব সেই সময় কতই-না যুগান্তাকরী ঘটনা ঘটেছে—সোভিয়েত রাশিয়ায় সাম্যবাদ, ইতালিতে ফাসিজম ও জার্মানিতে নাৎসিজমের উত্থান, দুটো বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা এবং সমগ্র পৃথিবীতে উপনিবেশ-বিমুক্তির সূত্রপাত। ১৯৪৭ সালে ভারতভাগের পর পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের এক ব্যাপক প্রসার ঘটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গণতান্ত্রিক দেশের সদস্য ছিল হাতেগোনা। দ্বিতীয়ার্ধে সে-সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। এ-সময়ের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের ঠাণ্ডা লড়াই যা আপাতদৃষ্টিতে শেষ হয় ইউরোপে সাম্যবাদের পতনের পরে। এখন আমরা বিবেচনা করব ভাষা আন্দোলনের ফলে গত বায়ান্নো বছরে কী কী পরিবর্তন আমাদের জীবনে এসেছে।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকায় জিন্নাহর বক্তব্য 'উর্দুই হবে একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' বিনা আপত্তিতে সম্মেলনে উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলী গ্রহণ করেনি। ছাত্রনেতা নাইমুদ্দিন আহমেদ প্রতিবাদে 'না' ধ্বনি তোলেন। বাংলাদেশে জন্ম হলো এক বিরোধিতার ঐতিহ্য। দেশের লোক আরবি হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করল। নজরলপ্রক্ষালন ও রবীন্দ্রবিরোধিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। একুশে ফেব্রুয়ারি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট একুশ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং এক অভাবিত জয় লাভ করে। কলহপ্রিয় হুজ্জতের জন্য জয়ের ফসল ঘরে তুলতে পারল না সেদিনের রাজনীতিকরা।

পাকিস্তানের প্রথম ১০ বছর কেন্দ্রীয় সরকার যে কত জনবিচ্ছিন্ন ছিল এবং এদেশের জনগণের সম্ভ্রমবোধকে কী দারুণভাবে অবজ্ঞা করেছিল, তার কিছু নির্দশন

দেওয়া যাক। দেশের মুদ্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষার একটিমাত্র শব্দ জুলজুল করতে দেখা যায়। পাসপোর্টে ইংরেজি, উর্দু, এমনকি ফারসিও স্থান পায়, কিন্তু বাংলা নয়। গণপরিষদের সিলমোহরে কেবল 'মজলিস-ই-দস্তুর সাজ' ও 'কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বিলি' শোভা পায়, কোনো বাংলা নয়। অবোধ্য ও কৃত্রিম উর্দুতে যে-জাতীয় সংগীত রচিত হয়, তা বাংলাভাষী কেন, সাধারণ উর্দুভাষীর পক্ষেও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ছিল। সেই সময় গণপরিষদের লবিতে বাংলায় কথা বললে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বলতেন, 'কেয়া ইয়ে চিনি জবান হ্যায়, কাঁহাসে লায়ে ইয়ে জবান ভাই।' মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানকে নামাজ পড়তে দেখে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বলেন, 'আপনি যখন নামাজ পড়েন তখন আপনি তো মুসলমান, তো ইয়ে বাংলাওয়ালাকি বাত ছোড়ো।' পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগ করার কথা উঠলে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা বলতেন, 'বাত তো ঠিক হ্যাঁয়, মাগার মাশরিকি পাকিস্তান আগর আলাহিদা হো যায়ে তো। লোগ ক্যাহতে হ্যাঁয়, মাশরিকি পাকিস্তান আলাহিদা হো যায়েগা।' লোকে ঠিকই বলেছিল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বানিয়ারা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে নিঃশেষিতভাবে শোষণ করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালায়।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের সময় ক্ষীণকণ্ঠে একটি আওয়াজ উঠেছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্র ভাসানো বাংলা চাই না।' পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতির জন্য আরবি হরফে বাংলা চালু এবং বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ করার যেসব চেষ্টা হয়েছিল, সকলই হলো পণ্ডশ্রম।

বয়োজ্যেষ্ঠদের সাবধানবাণী তোয়াক্কা না করে বাংলার যে-তরুণেরা ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে পরবর্তীকালে আবারও বয়োজ্যেষ্ঠদের সাবধানবাণী তোয়াক্কা না করে তাদের উত্তরসূরিরা ছয় দফা নয়, এক দফা বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দেয়।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করল। এক বছরের মাথায় বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়। সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয় : 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।' ১৫৩ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, সংবিধানের ইংরেজি পাঠ এবং বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বাংলা পাঠ-কে প্রাধান্য দেয়া হবে। একদিক থেকে দেখলে ভাষা আন্দোলন দ্রুত সাফল্য অর্জন করে। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান সেই ১৯৫৬ সালে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও, বলা হয়, পরবর্তী বিশ বছর অফিসে ইংরেজির ব্যবহার চালু থাকবে এবং তার পরও পার্লামেন্ট আইন পাশ করতে পারবে কী কী উদ্দেশ্যে ইংরেজি ব্যবহার করা যাবে। দশ বছর পরে প্রেসিডেন্ট ইংরেজি পরিবর্তনের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করবেন। অবশ্য বিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেও প্রাদেশিক সরকার প্রদেশে ইংরেজির পরিবর্তে যে-কোনো একটি রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিবৃত্ত হবে না।

১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদে উর্দু ও বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বলা হয় যে, যতদিন পর্যন্ত ইংরেজি সরানোর ব্যাপারে ব্যবস্থা না নেওয়া হচ্ছে, ততদিন অফিসের কাজে ও অন্য উদ্দেশ্যে অপর কোনো ভাষার, বিশেষ করে ইংরেজির ব্যবহার ব্যাহত হবে না। সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজি সরানোর ব্যাপারটা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট একটা কমিশন নিয়োগ করবেন। সেই কমিশন আর নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়নি।

ভাষা আন্দোলনের একটি উল্লেযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—সেই সংগ্রামের মধ্যে কোনো ভাষাবৈরিতা ছিল না। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন একদিক থেকে সফল ভাষা আন্দোলন বলে বিবেচিত হতে পারে। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭, 'একুশে ফেব্রুয়ারি'—শীর্ষক একটি ছোট কবিতায় আমি বলেছিলাম,

একুশে ফেব্রুয়ারি
সে শুধু বাংলাদেশের নয়
সে শুধু বাংলাভাষীর নয়
সে যে
সকল মানুষের মাতৃভাষার কথা কয়
সে যে সকল মানুষের কথা কয়।

সামরিক শাসনের সময় সংবিধানের নানা পরিবর্তন হয়। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক অনুযায়ী বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিধানের ইংরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যে বর্তমানে ইংরেজি পাঠ প্রাধান্য পাচ্ছে। প্রস্তাবনা, নাগরিকত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি-বিষয়ক ৮, ৯, ১০, ২৫ অনুচ্ছেদসমূহ, তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকারের ৩৮, ৪২, ৪৪ ও ৪৭ অনুচ্ছেদসমূহ, পঞ্চম ভাগ আইনসভার ৬৬, ৮০ ও ৯৩; ষষ্ঠ ভাগ বিচারবিভাগের ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০১ ১০২, ১১৬ ও ১১৭ অনুচ্ছেদ; দশম ভাগ সংবিধান-সংশোধনের ১৪২ অনুচ্ছেদ, একাদশ ভাগ বিবিধের ১৪৫ক ও ১৫২ এবং প্রথম তফসিল, তৃতীয় তফসিল এবং চুতর্থ তফসিলের সংশোধনের ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠের প্রাধান্য রয়েছে। আমরা বোধহয় সংকটকালে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম নই। তাই চতুর্থ তফসিলের ৩ক ইংরেজিতে লেখা হয় এবং তার বাংলা করা হয়নি। একুশের চেতনার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কী এক নিদারুণ পরিণতি!

সামরিক শাসনের প্রথমদিকে বাংলার চেয়ে ইংরেজির প্রচলন ছিল বেশি। রাষ্ট্রপতি বাংলায় নয়, ইংরেজিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পরিচিত হতে চাইতেন। আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারেও রাষ্ট্রভাষার প্রতি তেমন মর্যাদা দেয়া হতো না। সামরিক বাহিনীতে অবশ্য, যেমন : 'সামনে দেখ', 'আরামে দাঁড়াও' ইত্যাদি বেশকিছু হুকুম-নির্দেশের সুন্দর বাংলা তর্জমা করা হয়। দ্বিতীয় সামরিক শাসনের

সময় অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য বেশকিছু তৎপরতা দেখা যায়। নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য সামরিক প্রশাসন রাষ্ট্রভাষার দ্বারস্থ হয়। বাংলা ভাষা প্রয়োগের জন্য একটি বেসরকারি বিল—১৯৯৭ সালে ২ নম্বর আইন-পাশ করা হয়।

নিচের এক আদালত ইংরেজিতে লিখিত আপত্তি প্রত্যাখ্যান করায় 'হাশমতুল্লাহ বনাম আজমিরি বিবি মামলা'-র সূত্রপাত। প্রচলিত আইনে ইংরেজি ব্যবহারের যেসব বিধান রয়েছে, তা ১৯৮৭ সালের আইন পরিষ্কারভাবে বা পরোক্ষভাবে বাতিল করেনি এবং দেওয়ানি কার্যধারা আইন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক সরকার কোনো ঘোষণা দেননি এবং সেই আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী সরকার কোনো বিধিও প্রণয়ন করেননি। এইসব কারণে হাইকোর্ট ডিভিশন নিম্নের আদালতের আদেশ নাকচ করে দেন।

বাংলায় আইন পড়ে এবং বাংলায় আইন পরীক্ষা দিয়ে নিম্ন আদালতের যাঁরা বিচারক হন, তাঁদেরকে অ-বাংলা ভাষায় লিখিত আর্জি-বর্ণনাদি গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য হাইকোর্ট রায় দিলেন। ভাষাসৈনিকরা হাইকোর্টে হাশমতুল্লাহর মামলায় হেরে গিয়ে রণেভঙ্গ দিলেন এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় এ-ব্যাপারে কী হতে পারে, তা আদায়ের কোনো চেষ্টা করলেন না! বাংলা অক্ষরে স্বাক্ষর দিয়ে বা ইংরেজির নিচে নামকাওয়াস্তে বাংলায় নাম লিখে রাষ্ট্রভাষার দায় আমরা সহজেই চুকিয়ে দিচ্ছি! আজকাল বাংলায় প্রণীত আইনে বেশকিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন ইনস্টিটিউশন, একাডেমী, এডমিরালটি, এসিড, একাডেমিক কাউন্সিল, এক্সচেঞ্জ কমিশন, ওয়ার্কস কমিটি, কম্পিউটার, কমার্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, কপিরাইট, কোম্পানি, ক্যাডার, কোস্টগার্ড, গেজেটেড, গ্র্যাচুইটি, গ্রান্টস কমিশন, টেলিভিশন ট্রাস্ট, ট্যারিফ বোর্ড, ট্রাস্টি, ট্রেজারার, ডিন, ডেপুটি, চ্যান্সেলর, ডিপোসিটারি, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, পার্সোনাল ল, পেনশান, বোর্ড, ব্যাংক, ভাইস চ্যান্সেলর, মেয়র, মেডিক্যাল, রেজিস্ট্রার, লক আউট, লেভি, সাবচার্জ, সিকিউরিটিজ, সিটি করপোরেশন, সিন্ডিকেট, স্পেস। বাংলা প্রচলনের দিকে লক্ষ রেখে পরিভাষার জন্য অপেক্ষা না করে ইংরেজি শব্দের ব্যবহারের আমি সমালোচনা না করে স্বাগত জানাব। আধুনিক ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দ আত্তীকরণের জন্য এক আইনের সাহায্যে এক থোকে বাহাসা ইন্দোনেশিয়ায় ৩৭ হাজার ৭৯৫টি শব্দ গৃহীত হয়।

বাংলাভাষায় পরিভাষার অপ্রতুলতা এবং অসুবিধার কথা কয়েক দশক ধরেই বলা হচ্ছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমি ঘোষণা করছি আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তার পরে বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে

না। পরিভাষাবিদরা যত খুশি গবেষণা করুন আমরা ক্ষমতা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেবো, সে বাংলা যদি ভুল হল, তবে ভুলই হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।"

যা আছে তা-ই নিয়ে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করার এ এমন এক অঙ্গীকার যার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি একাত্তরের ৭ মার্চের 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এর ভাষণে। এই বক্তব্যে সাধারণ মানুষের দাবি প্রতিফলিত হলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পরিভাষার পিছনে আর না দৌড়ে সহজে ইংরেজি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করছে। তথ্য প্রযুক্তির যুগে পরিভাষার জন্য বসে থাকার সময় নেই কারোর। 'মাউসের' পরিভাষা ইঁদুর না মুষিক হবে, সেই দুশ্চিন্তা না করে আমরা মাউসই ব্যবহার করছি।

বাংলাদেশসহ সাতাশটি দেশ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়ার জন্য ইউনেস্কোর নিকট একটি প্রস্তাব দেয়। কেবল একটা দেশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের তেমন কোনো যৌক্তিকতা প্রথমে খুঁজে পায়নি কয়েকটি পশ্চিমা দেশ এবং প্রস্তাবের পক্ষে সায় দেয়নি। পরে ১৮৮৬ সালের ১ মে শিকাগো শহরে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে যে সারা পৃথিবীতে মে দিবস পালিত হচ্ছে, সেই নজির উত্থাপন করা হলে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর কোনো আপত্তি ওঠেনি। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সর্বসম্মতভাবে ইউনেস্কোর প্রথম ও দ্বিতীয় কমিশন বাংলাদেশের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কথাটা অহঙ্কারের মতন শোনাবে। উপরিউক্ত '২১ ফেব্রুয়ারি' শীর্ষক কবিতার প্রথম ছয় লাইন ছিল :

যেমন মে দিবস
শুধু শিকাগো শহরের কথা কয় না
শুধু শিকাগোর শ্রমিকের কথা কয় না
শুধু দুনিয়ার শ্রমিকের কথা কয় না,
যেমন মে দিবস সকল মানুষের কথা কয়

ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে চিহ্নিত করার ফলে আমাদের দায়িত্ব বেড়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বলে আমরা অহঙ্কার করি।

আবার সেই দিবস যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের জন্য যখন কোনো বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের কাছে তথ্যাদি চায়, তখন তা আমরা সরবরাহ করতে পারি না এবং যেটুকু পারি, তা সময়মতো জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা তৎপর নই। আমাদের শুধু বাংলা ভাষা নয়, বাংলাদেশের সীমানায় অন্তর্ভুক্ত সকল ভাষার উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে।

মাতৃভাষার প্রতি প্রেম যেন আমাদেরকে অমাতৃভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট না করে। এজরা পৌন্ড বলেছিলেন, 'মানবিক প্রজ্ঞার সব মোদ্দাকথা একটি ভাষায় বিধৃত নেই।' পৃথিবী বরাবরই বহুভাষী। একভাষিতাকে ভাষাবিদরা নিরক্ষরতার মতো খারাপ জানে। একটিমাত্র ভাষায় সব কাজ সারা বড় মুশকিল। আজ বিশ্বায়নকে যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারব না, তেমনি ইংরেজি ভাষার প্রচলনকেও ঠেকাতে পারব না। সারাবিশ্বে ১০০ কোটি লোক আজ মাতৃভাষা বা দ্বিতীয় বা বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহার করছে। প্রয়োজনেই আমাদের বিদেশী ভাষা শিখতে হবে। তবে দেশের সকল লোককে যখন আমরা মাতৃভাষায় সাক্ষর করতে পারিনি, তখন একাধিক ভাষার ভার সকল শিশুর ওপর গোড়া থেকে চাপিয়ে দেয়া সঠিক হবে না। পৃথিবীতে বহু শিশুর ভাষা শেখার দক্ষতা নানা কারণে আড়ষ্ট থাকে। আত্মপরিচয় বা আত্মপ্রকাশের জন্য মাতৃভাষাই তাদের একমাত্র ভাষা। মানবসত্তার প্রতি মর্যাদাশীল হয়ে এবং মানবশিশুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শিশুদের নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে বড় হওয়ার সব সুযোগ করে দিতে হবে। ভাষার অনেক কাজ। জীবিকা অর্জনেও ভাষা সহায়ক হতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ জীবনের জন্য মাতৃভাষা একান্তই প্রয়োজন।

আজ এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে যে-শিক্ষা দেওয়া হয়, তা সহজে উপলব্ধির বিকাশ ঘটায় এবং দ্বিতীয় ভাষা অর্জনেও সাহায্য করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ আজ একটি মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। ভাষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাতে উদ্দীপনাহীন ও ভগ্নহৃদয় না হয়, তার জন্য সরকারি ভাষাকে যেন একমাত্র ভাষা হিসেবে সর্বত্র ব্যবহার না করা হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জনের পরপরই রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন যেন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে একুশে মিনারের পাদপীঠে বাংলাভাষার ত্যাজ্যপুত্ররা কুৎসিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। একুশে মিনার দখল করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অব্যাহতভাবে চরদখলের রেষারেষি চলে, কিন্তু রাষ্ট্রকর্ম ও দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রভাষার কী ভূমিকা থাকবে, সে-সম্পর্কে তেমন কোনো উদ্দীপনা দেখা যায়নি।

আমরা যাদেরকে রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষ বা শত্রু ভাবি, তাদেরকে শহীদমিনার চত্বরে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাধা দিই। তিন বছর আগে ছাত্র-নামধারী নন্দীভৃঙ্গিরা জুতোপায়ে শহীদমিনারে উঠে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও অন্যদের নিবেদিত পুষ্পস্তবকগুলো ছিন্নভিন্ন করে। পাকিস্তানিরা যে-আক্রোশে শহীদমিনার গুঁড়িয়ে ভেঙে দেয়, তা বোধগম্য। বাংলাভাষী বখাটেদের বেয়াড়াপনা বড়ই দুঃখবহ।

মাতৃভাষার প্রতি আমরা যে নিদারুণ অবহেলা প্রদর্শন করি, তা বিস্ময়কর। এ-যাবৎকাল সকল নির্বাচিত সরকারই, সে একুশ-একাত্তরের চেতনার পক্ষে

উচ্চকণ্ঠ বা অনুচ্চকণ্ঠ হোক, রাষ্ট্রভাষার জন্য তেমন কোনো কৌতূহল, উদ্বেগ বা উৎসাহ দেখায়নি। ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতা থেকে প্রতিপক্ষকে টেনে ফেলে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রভাষার তো তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। মাতৃভাষার অধিকতর ব্যবহারের জন্য আমরা সংসদে বেসরকারি আইন পাশ করি, কিন্তু সেই আইন কার্যকর করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করি না। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রভাষার পরিবর্তে ইংরেজিতে ভাষণ দেয়া হয় তা উল্লেখ করা হলে ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে বলা হয় 'কেউ কিছু বলেছে নাকি!' এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন বিরাজ করবে, ততদিন দিবস পালন জাতীয় পর্যায়ে হোক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়েই হোক, তা হবে এক নিছক আনুষ্ঠানিকতা। প্রত্যেক বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের কথা দেশের সব সংবাদপত্রের শিরোনামে শোভা পায়—'সারাদেশে সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের অঙ্গীকার।' সেই অঙ্গীকার আমরা সত্য জেনে পালন করছি না।

শিক্ষিতমহলে ইংরেজিপ্রেমীদের প্রায়ই মাতম করতে দেখা যায়, ইংরেজি ছাড়া দেশটা কেমন করে চলবে? আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো ইংরেজিতে লেখা এবং সেক্ষেত্রে ভালো ইংরেজি জ্ঞান না থাকলে বহুজাতিক কোম্পানি বা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমানে-সমানে কথা বলতে না পারলে আমরা হেরে যাব। সফ্‌ট্‌ওয়্যারের স্বর্ণদ্বার-ও আমরা অতিক্রম করতে পারব না। যে-কোনো হিসেবে ইংরেজিতে পারদর্শী কেজো লোকের প্রয়োজন কয়েক সহস্রের বেশি হবে না। জাতিসংঘের কাজে ভাড়া খাটার জন্য এবং উন্নত দেশে শ্রমনিবিড় নোংরা কাজ করার জন্য দেশের সকলকে কি রানীর ইংরেজি শেখার দরকার আছে? শেখাতে জানলে বেসিক ইংরেজি শিখতে তো বেশি সময় লাগার কথা নয়। মাতৃভাষা হোক বা বিদেশী ভাষা হোক আমাদের ভাষা শেখানোটা বড়ই সেকেলে, বড়ই দুর্বল।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় এখনও বাংলা ভাষায় দেয়া হয় না। কয়েক বছর আগে হাইকোর্ট ডিভিশন ২/১টি রায় বাংলা ভাষায় দিয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন আমাদের কাছে একটি শোকদিবস এবং সেইদিনে মেলাও বসে, বিশেষ করে এশিয়ার একটি অনন্য বইমেলা। সবচেয়ে বড় কথা, আজ বাংলা ভাষায় বলতে, লিখতে বা দরখাস্ত করতে কোনো নাগরিক বিব্রত বোধ করে না। উচ্চশিক্ষায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এমন একটি ধারণা আছে যে, প্রশ্নোত্তর বাংলায় হলে পরীক্ষায় ভালো করা যাবে না। অর্থশাস্ত্রের মতো দুরূহ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর বাংলায় প্রদান করে কেউ যে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে সাফল্য লাভ করতে পারেন, তার প্রমাণ দিয়ে নুবান আহম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এক আততায়ীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে তিনি মারা যান।

দেশের নেতাদের একসময় 'শেরে বাংলা', 'কায়েদে আযম' বা 'কায়েদে মিল্লাত' নামে অভিহিত করা হতো। গঙ্গা-যমুনা-মেঘনার দেশের ছেলেরা তাদের

নেতা শেখ মুজিবকে বাংলা ভাষায় 'বঙ্গবন্ধু' সম্মাননায় ভূষিত করল। আমাদের ভাষা আন্দোলনের এ এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বহুবিধ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা আজ বাংলা নামে অভিহিত। বাজারে, হাটে দোকান-বিপণির নামও বাংলায়। তবে দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষা এখনও এক দারুণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে।

ভাষার বানান নিয়ে আমাদের মধ্য কোনো ঐকমত্য নেই। বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানান সেই প্রতিষ্ঠানেরই প্রকাশিত সব বইয়ে অনুসরণ করা হচ্ছে না। দেশের সংবাদপত্রগুলোর ভাষার মধ্যে ছত্রাকার অবস্থা—কোনোটি সাধু, কোনটি চলতি আবার কোনোটি উভয় ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করছে।

অনেকেই ষত্ব-ণত্ব জ্ঞানের পার্থক্য রক্ষা করতে চায় না। এমনকি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় চন্দ্রবিন্দু-বিদ্বেষীরা মাস্তানি করছে। ভাষায় নৈরাকার থাকলে স্বভাবেও তার প্রভাব পড়বে। বড় দুঃখের কথা, দেশের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ভাষা সাহিত্য উন্নয়নে নিয়োজিত বাংলা একাডেমীসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ওপর ভাষার শাসন-প্রশাসনে যে-গুরুদায়িত্ব রয়েছে, তা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না।

বিশ্বায়নের পরিবেশে ইংরেজি রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীর বহু ভাষা আজ মুমূর্ষু এবং বিপন্ন। বাংলাদেশের মুসলমানদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে, তারা তাদের ভাষা ও লিপি পরিত্যাগ করেনি, যদিও এ নিয়ে নানান কথা উঠেছে বারবার। আজ বাংলা পৃথিবীর প্রধান ১২টি মহাভাষার একটি ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে ৩০৭টি ভাষায় লোকে কথা বলে—সেখানে আজ বাংলা দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা। মাতৃভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সন্দেহ নেই।

একধরনের উন্নাসিক ব্যক্তিরা অবশ্য মাতম করছেন এই বলে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষার মানে ধস নেমেছে। পাঠ্যবিষয় নির্বাচন, পঠন-পাঠন এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণে যে-অনুশীলন, শৃঙ্খলা ও যত্নের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তার সমালোচনা না করে আমরা মাতৃভাষার দুর্নামে ব্যস্ত। আমাদের বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। আলস্যবশত সেই ভাষাকে উন্নত ও অধিকতর কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য করার জন্য আমরা তেমন প্রয়াস পাই না। আমাদের অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা মুমূর্ষু নয়, বিপন্নও নয়। আজ ভাষার রাজ্যে পৃথিবীতে বাংলা-সূর্য অস্ত যায় না। বাংলা ভাষা দীর্ঘজীবী হোক।

দৈনিক জনকণ্ঠ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ২০০৫

আগরতলার বইমেলায়

বই> বহি> ওহি—'বই' কথাটা আরবি 'ওহি' শব্দ হতে উদ্ভূত। 'ওহি'র মধ্যে আক্ষরিক থেকে মরমি নানা অর্থচ্ছটা রয়েছে। এর এক অর্থ প্রেরণা। কে কোথা থেকে প্রেরণা পায় বা প্রেরণা কখন কোথা থেকে আসে বলা মুশকিল। প্রেরণা একই সঙ্গে এক অস্থিরতা ও সৃষ্টির জন্ম দেয়। বাংলায় একটা কথা আছে, লেখার কিল ভূতে কিলায়। আবার যার সাধ্য নাই অথচ লেখার বাসনা রয়েছে তার সম্পর্কে লোকে রহস্যচ্ছলে বলে, 'কলপাতা না এগুতেই পুঁথি লেখার সাধ।'

বইপদবাচ্য হতে হলে একটি গ্রন্থনায় ন্যূনতম কত পৃষ্ঠা থাকতে হবে সে-সম্পর্কে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংগঠন একটা নির্দেশনা দিয়েছে। সাময়িক নয় এমন একটা মুদ্রিত প্রকাশনা, যার মলাট-প্রচ্ছদ ছাড়া উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা রয়েছে তাকে বই হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। 'বই'-এর এই সংজ্ঞা পরিসংখ্যানের নিমিত্তে কিছু প্রয়োজন মেটালেও তা তেমন সন্তোষজনক নয়। মেকআপ-এর কারসাজিতে পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠাকে উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা পার করানো যায় বৈকি!

কালি কলম মন—তিনজন মিলে বই লেখে। লিখন, কাগজ এবং মুদ্রণ—এই তিনজনে বই প্রকাশ করে। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে কাগজের জন্ম হয় চীনদেশে। তুর্কিদের আগমনের পর এদেশে কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। মুদ্রণও প্রথমে চীনে উদ্ভাবিত হয় কিন্তু তেমন বিস্তার লাভ করেনি। ইংরেজ আমলে ১৭৭৮ সালে সর্বপ্রথম হুগলিতে ছাপাখানার জন্য বাংলা হরফ ঢালাই করা হয়। এখন ডেস্কটপের বদৌলতে ঘরে বসে বই লেখা ও প্রকাশ করা দু-ই সম্ভব। হাতে লেখা কোরানের কদর ছিল বেশি এবং তা লেখা পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হতো। খলিফা ১৮২৫ সালে প্রথম কোরান মুদ্রণের অনুমতি দেন।

বই প্রকাশনা একটা ব্যবসা। টাকার প্রভাবকে ছোট করে দেখা যায় না। প্রকাশক তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারবেন না। প্রকাশকদের

বিনিয়োগ করতে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়, এটা মনে রাখতে হবে। বেশির ভাগ প্রকাশকের পাঠ্যপুস্তকের বাজারের দিকে লক্ষ্য। 'বই চালানো' বা 'বই ধরানো'-র জন্য নানান প্রয়াস। প্রকাশকের বিরুদ্ধে লেখকের ক্ষোভ সর্বদেশে। লেখকদের ক্ষোভের কারণ, প্রকাশকরা প্রায়ই কত বই ছাপা হয়েছে তা খোলাসা করে বলতে ইতস্তত করেন। অনেক সময় দাদন দিয়ে প্রকাশকরা গরিব লেখকদের বাঁচিয়ে রাখেন। যে-লেখকের বইয়ের জোর-কাটতি তিনিই কেবল অগ্রিম চাইতে পারেন। একটি বইয়ের প্রথম সংস্করণ আমরা সাধারণত সাড়ে বারোশো কপি ছাপাই। উন্নত দেশে কোনো প্রকাশকের কাছে এ-ধরনের মশকনিধন উদ্যোগ তেমন আকর্ষণীয় হবে না। সেসব দেশে হাজার হাজার কপি বই ছাপানোর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়।

অন্যান্য আইন—যেমন, কপিরাইট আইনও তেমন মান্য করা হয় না। লেখকরা কপিরাইট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে নিজেদের লেখকস্বত্ব রক্ষার জন্য নিবন্ধীকরণের তেমন কোনো চেষ্টা করেন না। এ-ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নেওয়া বেশ ঝকমারি। লেখকরা তেমন উৎসাহিত বোধ করেন না। কপিরাইট লঙ্ঘনরোধে উন্নত দেশগুলো নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর।

বই কেনা, বই ধার করা এবং বই মেরে দেয়া—বই যোগানোর এই ত্রিবিধ পন্থা বহু পুরাতন এবং পরীক্ষিত। যিনি স্বভাবে চৌর্যোন্মাদ, ভূতের মারের ভয়ে হয়তো তিনি মহাবিদ্যার আশ্রয় নেন। তাঁকে নাহয় আমরা একটু-বা নেহাই করলাম। লেখক ও প্রকাশকদের জন্য বড় সুখবর ও আনন্দের কথা যে, বই কেনার প্রতি ইদানীং আগ্রহ বেড়েছে। মূর্খ লোকে কিনে বই, জ্ঞানী লোকে পড়ে, ধনবানে কিনে ঘোড়া বুদ্ধিমানে চড়ে—এই পুরনো প্রবাদ একটু ফিকে হয়ে গেছে।

সমাজের অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের ওপর ভরসা করে যাঁরা প্রকাশনা পেশা ধরে রেখেছেন তাঁদের সাধুবাদ জানাতে হবে। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে প্রকাশনা-ব্যবসার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আপন স্বার্থচিন্তায় প্রকাশকরা সাক্ষরতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ নিলে সকলের জন্য তা বড় মঙ্গলময় হবে।

ফ্রান্সিস বেকন বইয়ের তিনরকম রকমভেদ করতেন : কিছু বই আছে চোখে দেখার, কিছু বই আছে গিলে ফেলার এবং কিছু বই আছে চিবিয়ে চিবিয়ে পড়ে হজম করার। 'বই' ও 'ভালো বই' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যবিচার : 'বই জিনিসটা ভাবপ্রকাশ ও রক্ষার একটা আধার মাত্র। কিন্তু অনেক সময় সে-ই নিজে সর্বেসর্বা হইয়া ওঠে। তখন সে বই পড়িয়া মনে হয় এ কেবল বই পড়িতেছি মাত্র। এগুলো কেবল লেখা। ভালো বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি, ভাব ও তত্ত্বের সহিত মুখোমুখি পরিচয় হয়, মধ্যস্থতা পদার্থটা চোখেই পড়ে না।'

বয়সভেদে পাঠকের কৌতূহল। আবার পাঠকেরও মৃত্যু হয়। একসময়কার সাড়াজাগানো বই পরবর্তীকালে পাঠকের কাছে অসার ও নিঃসাড় মনে হতে পারে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লেখার বছরদুয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে এক নীরব মহাশব্দের উল্লেখ করেছেন যার মাঝে মানুষ আপনার পরিত্রাণকে বাঁধিয়ে রেখেছে : 'মহাসমুদ্রের শত বছরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

'বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে! অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের ওপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

'লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার ওপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।'

বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে আমরা লক্ষ করি প্রখ্যাত প্রশাসকরা শিক্ষিত ছিলেন বা শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং দক্ষহস্তে গ্রন্থাগার বা কুতুবখানার দেখভাল করতেন। শাসন বা শোষণ করতে হলে বিদ্যা অপরিহার্য।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেখানে ছেলেমেয়েদের বই পড়ে শোনানো হয় এবং যে-ছেলেমেয়েরা তাদের বাপ-মাকে বই পড়তে দেখেছে তাদের লেখাপড়া শুরুতেই বেশ ভালো হয়।

আজকের তথ্যযুগে মুভি, টিভি ও ইন্টারনেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইয়ের ব্যবসা লাটে উঠতে পারে—নিরাশাবসীদের এমন দুশ্চিন্তার মুখে ছাই দিয়ে বইয়ের ব্যবসা সদর্পে টিকে আছে। কম্পিউটারের স্ক্রিনে চিকিমিকি লেখার চেয়ে সাদা কাগজে কালো আখর যেমন আমাদের নয়ন জুড়ায় এবং মরমে পশে, তার আর তেমন জুড়ি নেই।

পাঁচ দিন আগে একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করলাম। একটা দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এ এক পরম অহঙ্কার যে, সেই দেশবাসীর কল্যাণে বর্ষপঞ্জির একটা দিন আজ সারা দুনিয়ায় বিশেষ মর্যাদাসহকারে পালিত হচ্ছে। আমি এক ছোট্ট কবিতায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে দুনিয়ার মজদুরদের মে-দিবসের সঙ্গে তুলনা করি। মে দিবস যেমন, একুশে

ফেব্রুয়ারি তেমনি সকল মানুষের জন্য। সেই জন্মলগ্ন থেকে আমাদের ভাষা আন্দোলনে কোনো ভাষাবৈরিতা ছিল না। সমকালীন প্রগতিবাদী চিন্তাধারার দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তৎকালীন পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রগতিবাদী আমাদের ভাষার সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন। আমরা চেষ্টা করছি দেশের কুড়িটি মাতৃভাষার যেন উন্নতি হয় এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে যেন শৈশব-কৈশোরে বিদ্যাচর্চা করতে পারে। আমার কাছে এ এক বড় আনন্দের কথা যে ত্রিপুরায় বাংলাভাষী এবং অ-বাংলাভাষী সকলেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষারম্ভ করতে পারছে। আজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'স্বদেশ স্বদেশ করিসরে ভাই এদেশ তোদের স্বদেশ নয়'—এমন মন খাঁ-খাঁ করা হাহাকার যেন কোনো গোষ্ঠীর কারো মনের মধ্যে না জাগে তার জন্য আমরা তৎপর থাকব—এমন অঙ্গীকারের জন্য ত্রিপুরার আগরতলা এক প্রশস্ত স্থান। বিশ্বায়নের রথের তলায় কোনো জনগোষ্ঠী যাতে গুঁড়িয়ে না যায়, তার জন্যই আজ মানবাধিকার এবং সংস্কৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্ন উঠেছে। কোনো সংস্কৃতি যেন ফসিল বা জীবাশ্মে পরিণত না হয় বা নৃতত্ত্ববিদের কেবল যেন কৌতূহলের বিষয় না হয়।

ককবরকভাষী ভাই ও বোনদের জন্য আমার বক্তব্যের কিছু পুনরুক্তি :

ককবরক সানাই তাখুকবুখুকরগ, সালা সীকাং ২১ ফেব্রুয়ারি চুং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সাল পালাইখা। কাইসা বিগ্রা চাসানা নাই তংনাই দেশনি থানি'খা ওয়াবনা কক অম-ন' আ দেশনি দারাতুই-ন বদরনি সালসা সারা দুনিআঅ বরম রুউই পালাইয়জাগে'। আঙ ককলব বীসাতে কাইসাঅ ২১ ফে ব্রুয়ারীন' দুনিয়ানি মজদুর রগনি মে সাল বাই তুলনা রুঅ। মে সাল আহাই-ন ২১ ফেব্রুয়ারীর জত' বরকনি বাগুই। সংচাজাকদ্রপনি সিমি-ন চিনি ভাষা আন্দোলন' কুনু ককন' নাগ্রোমা-কুকই। আ জরানি প্রগতিবাদী ওয়ান উানসক্মুং বাই চুং বেং জাকমানি। অফ্রুনি পাকিস্তানুনি জুদা প্রগতিবাদী মত মানিনাইরগ চিনি তাষানি সংগ্রামে। খা গথকরীঅ। চুং নাইখা দেশনি ২০টা মানি ককনি উন্নতি অংথুং তাই জত-ন জানি জানি মানি কক বাই চেরাই ফুরু পরিউই মানথুং। অম' সতনুই-ন তংথকনা কক ত্রিপুরাঅ বাংলা সানাই তাই বাংলা সায়া জত-ন মানি কক চাই সুরুংমা চেংগুই মানো। 'সাকনি দেশ সাকনি দেশ হো হীন' জত-ন তাখুক অ দেশ নিনি দেশ য়া'—অমতুই খা খামনাই তমুং কুনু বসংনি বিসিং তা কাসাথু—অমতাই ককনি বাগুই ত্রিপুরানি আগারতলা জাগা কুড়ার কাউসা। বিশ্বায়ননি রথুনি তলাঅ কুনু বসং ফেরজাক য়াতুই, বনি বাগুই-ন তিনি মানবাধিকার তাই হুকুমুনি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারনি কক কাসাঅ। কুনু হুকুম ফসিল এবা মাংথাপ্পা চায়াতুই এবা নতৃত্ত্ববিদনি নায়তুকজাগনাই সিমি অংয়াতুই।

[ককবরকের অনুবাদ কবি শ্যামলাল দেববর্মার সৌজন্যে]

আজ আমি দ্বিতীয়বারের মতো আগরতলায় এসেছি। বছরদুয়েক আগে এসেছিলাম আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে ত্রিপুরায় বাংলাভাষার কী অবস্থান তা দেখার জন্য। এবার ২৩তম আগরতলা বইমেলায় আমাকে ও আমার সহযাত্রী অধ্যাপক

মেজবাহ কামালকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদেরকে আবারও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন ত্রিপুরাবাসী। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে ত্রিপুরার সকল জাতির মানুষ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে সহায়তা দান করেন তা কোনোদিন ভুলবার নয়। এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমানসংখ্যক শরণার্থীকে আপনারা এক রাজনৈতিক মহাদুর্যোগের সময় আশ্রয় দেন এবং নানাভাবে আমাদের সাহায্য-সহায়তা দান করেন। দুর্গত মানুষের প্রতি অনুকম্পায় এই সাহায্য এতই স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বাভাবিক ছিল যে সেই আকস্মিক শরণার্থীদের ঢলে কোনো বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। সেদিন আমাদের জন্য আপনারা নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দেন। যে-জনগোষ্ঠী এত বড় ঝুঁকি নিতে পারেন, তাঁর ঔদার্য, দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতা সকল মানুষের জন্য এক মহাদৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সেই বিপদের সময় যে রাখিবন্ধন ঘটেছিল তা স্মরণ রেখে আমরা এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে ব্রতী হব। এ-রাজ্যের সকল মানুষের প্রতি এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এই উপত্যকার অশ্বারোহীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আপনারা ভালো থাকুন। অশেষ ধন্যবাদ।

২৩তম বইমেলায় উদ্বোধকের বক্তব্য আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

বাংলা ভাষার সূর্য অস্ত যায় না

হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন ও দৈনিক প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে 'ভাষা প্রতিযোগ ২০০৫'-এর বিভাগীয় এবং ঢাকা মহানগর প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। সাতটি আয়োজনে কয়েক সহস্র কিশোর-কিশোরীর কাছে এ ছিল একের মধ্যে তিন—শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনোদনের ক্ষেত্রে এক রোমাঞ্চকর ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঢাকা বিভাগের প্রতিযোগ অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহে। পরে চট্টগ্রাম, বগুড়া, যশোর, মৌলভীবাজার ও বরিশালে যথাক্রমে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থী প্রতিযোগে অংশ নেয়।

আজ ঢাকায় চূড়ান্ত অন্তিম অনুষ্ঠান।

ভাষা আমাদের একটা বড় আশার জায়গা। এই আ-মরি বাংলা ভাষাকে ঘিরেই আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় পরিণতি লাভ করেছে। আমাদের ভাষা আন্দোলন শুরু থেকে এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্যে সুষমামণ্ডিত ছিল। আমাদের মধ্যে ভাষাবৈরিতা ছিল না। আজ ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে যে পালিত হচ্ছে তা আমাদের বড় গৌরবের কথা। এর জন্য আমাদের ওপর যে বড় দায়িত্ব পড়েছে তা আমাদের সুচারুভাবে পালন করতে হবে। আমাদের ছাত্ররা স্নাতক-পরীক্ষায় পাশ করেও কোনো ভাষায়—না বাংলা না ইংরেজিতে—প্রয়োজনীয় পারদর্শিতা লাভ করছে না। মাতৃভাষায় যে দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমাদের বড় আশঙ্কার আর একটি কারণ, যে-ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ২০০ বছরের বেশি—সেই ভাষাও আমরা যে আয়ত্ত করতে পারছি না তার কারণ মাতৃভাষার ভিতটা দৃঢ়ভাবে সুগঠিত হচ্ছে না। মাতৃভাষা

মাতৃদুগ্ধসম, বলবর্ধক ও বিদ্যালাভের সহজ মাধ্যম। ভাষা প্রতিযোগ সেই অবশ্য-অধিগম্য লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই উদ্যোগ আনন্দদায়ক হয়েছে আনুষঙ্গিক নানা বিনোদনকর্মের সহযোগে।

ময়মনসিংহে ক্লাস সিক্সের ছাত্র শাহ মোহাম্মদ রাজু হঠাৎ করে নায়ক হয়ে উঠল একটি প্যারোডি গান গেয়ে :

'আম্মু আমার কয় কেন পড়তে বসিস না
আব্বু আমায় কন কেন লিখতে বসিস না
কী করে বলি আমি লেখাপড়া
ভালো লাগে না, ভালো লাগে না
...হঠাৎ যদি এমনি হতো,
মাস্টারেরা পড়ালেখা ভুলে যেত
আসত যদি ঘুর্ণিঝড়
ভেঙে পড়ত স্কুলঘর
জুম্মাবারে সিন্নি দিতাম মনের বাসনা।'

শাহ মোহাম্মদ রাজু সবাইকে আশ্বস্ত করে বলে গানের কথাগুলো তার মনের কথা মোটেই নয়। গান তো গানই।

ভাষা প্রতিযোগে ছেলেমেয়েরা বড়দের গুরুমারা প্রশ্ন করে। 'বাংলা ভাষার উদ্ভাবক কে?'

—জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা সৃষ্টি হয়, এককভাবে কেউ ভাষা সৃষ্টি করে না।

একজনের প্রশ্ন : 'প্রতিযোগ ও প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য কী?'—*বঙ্গীয় শব্দকোষে* হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় 'প্রতিযোগে'র চারটি অর্থ দিয়েছেন : বিরোধ, বিরুদ্ধসম্বন্ধ, পুনরুদ্যোগ ও প্রতিকারোপায়। প্রতিযোগ, প্রতিযোগিতা, দুটোর অর্থ প্রায় একই—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ। প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতা এসেছে প্রতিযোগ থেকে।

বাংলা ভাষায় শব্দসংখ্যা কত?—১ লাখ ৩৫ হাজার। ইতিমধ্যে কিছু নতুন বিদেশী শব্দ বাংলা হয়ে গেছে।

একজন জিজ্ঞাসা করে, 'সঞ্চয়িতা শুদ্ধ না সঞ্চিতা শুদ্ধ।'—সঞ্চিতা শুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা ১৫ ফর্মা ছাপা হয়ে যাওয়ার পর জানা গেল সঞ্চয়িতা শুদ্ধ নয়। তখন আর করার কিছু নেই। তারপর সঞ্চয়িতাও চালু হয়ে গেল।

একজন প্রশ্ন করে ক খ গ—এ-বর্ণমালার আবিষ্কারক কে?—এককভাবে কেউ আবিষ্কারক নয়।

একজন প্রশ্ন করে, 'বাংলা বর্ণমালা কে প্রথম লেখেন।'—সৌরভ সিকদার জানান, '১৮ শতকে লিসবনে ফাদার মানুয়েল।'

একজন প্রশ্ন করল, '৫২ সালের পরে বাংলা ভাষার জন্য আর কেউ কি শহীদ হয়েছিলেন?'—১৯৬১ সালে আসামের শিলচরে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে ১১ জন শহীদ হন।

যশোর অঞ্চলের কথা 'নাতি-খাতি বেলা গেল শুতি পাবলাম না। প্রশ্ন হলো নাতি-খাতি-শুতি—এ-শব্দত্রয় কী?'—ক্রিয়া। 'কোন ক্রিয়া?'—অসমাপিকা ক্রিয়া। চার অক্ষরবিশিষ্ট কোন শব্দের প্রতিটি অক্ষরের আগেই আছে 'কে-কার?—একজন ছাত্র সঠিক উত্তর দিল—'এলেবেলে।'

নেপালের রাজদরবার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগ্রহ করা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের দাবিদার কি শুধু আমরাই? অসমিয়া ও ওড়িষ্যাবাসীরা কী বলেন?

২১শে ফেব্রুয়ারিকে আমরা ৮ই ফাল্গুন বলি না কেন? বাংলা সাল অনুসরণ করার রেওয়াজে এটা একটা নিপাতনে সিদ্ধ ব্যাপার। তারিখটা সেই বায়ান্ন সাল থেকে আমাদের আপন, বাংলা হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতিলাভের পর ওই তারিখটা সারা বিশ্বের কাছে যে-সমাদর লাভ করেছে তা আমাদের গৌরবের কথা। আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যেখানে যেখানে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' আছে সেখানে সেখানে '৮ই ফাল্গুন' প্রতিস্থাপিত করতে হলে তা হবে এক বড় পণ্ডশ্রম।

ভাষা শেখার প্রথম কাজ উচ্চারণ শেখা। এক-একটি শব্দ ধরে শেখার চেষ্টা না করে প্রথম থেকে বাক্য ধরে শেখার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

বাক্যের সঙ্গে প্রথম প্রথম পরিচয়ে ব্যাকরণে হাতেখড়ি পড়ে। ভাষাবিদরা বলেন, ব্যাকরণের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য সাতটি বাক্যের অনুশীলন প্রয়োজন। একাধিক বাক্যের মাধ্যমে প্রত্যেকটি নতুন শব্দের পরিচয় গড়ে তুলতে হবে। বক্তব্য বোধগম্য হতে হবে। অতিরঞ্জন নয়, প্রাঞ্জল; কঠিন নয়, সহজ হতে হবে। প্রত্যেক ভাষার একটা সুর বা কথনভঙ্গি আছে, যা আয়ত্ত করতে হবে। প্রত্যেক ভাষায় কিছু ব্যতিক্রম বা নিপাতনে সিদ্ধ ব্যাপার থাকে। সে নিয়ে দুর্ভাবনা না করে সাধারণ নিয়মগুলো জানতে হবে। একদিক থেকে একটি ভাষায় কথা বলা সহজ বা স্বাভাবিক মনে হয়। কোনো বিশেষ তালিম না পেয়েই শিশু-কিশোরেরা জন্মের বা মায়ের ভাষা শিখে নেয়। আর একদিক থেকে প্রত্যেক ভাষাই বড় জটিল। বৈদগ্ধে কোনো ভাষা কারো চেয়ে কম নয়। হেলায় যে ভাষা আয়ত্ত হয়, অবহেলায় সে-ভাষায় কিন্তু দক্ষতা জন্মে না।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশটি ভাষা থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেশ কিছু বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় আজ আমরা সহজেই ব্যবহার করছি। আমাদের ভাষার অভিধানে শব্দের একটা ঠিকুজি দেওয়া থাকে। অভিধানকর্তাদের সংস্কৃতের প্রতি ঝোঁক। তাই অনুমান করে সংস্কৃতের সঙ্গে সাদৃশ্য খোঁজা হয়। একসময় আমরা বেশ কিছু শব্দ সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাবতাম, সেগুলো আজ দেশী বলে চিহ্নিত। এই দেশী শব্দকে রবীন্দ্রনাথ খাস বাংলা বলতেন। আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎস খুঁজতে গেলে দেশী শব্দের কাছে যেতে হবে। খাওয়া-দাওয়া, কেনাবেচা, খেলাধুলো, রোগব্যাধির টোটকা নিয়ে আমরা যদি হঠাৎ করে ঠিক করি বিদেশী

শব্দ বর্জন করব তা হলে টেনেটুনে দেশী শব্দ দিয়ে আমাদের সংসার সহজেই চালাতে পারব। তবে ভাষার জাতীয়তাবাদ ভালো জিনিস নয়, ভাষাবৈরিতা আরো খারাপ। বাংলাভাষীদের মধ্যে তেমন ভাষাবৈরিতা নেই। গ্রামের লোক ইংরেজি শব্দ সামান্য পরিসরে ব্যবহার করে। স্ত্রীকে সম্মান জানানোর জন্য ওয়াইফ বলে। দলাদলি বা দল পাকানোকে 'কুমটি' করা বলা হয়। আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

বাঙালিদের মধ্যে অনৈক্যের সহজতম প্রমাণ 'বাঙালি'র ছয় রকম বানান। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে বানানের স্বেচ্ছাচার বড়ই পীড়াদায়ক। সংবাদপত্রের জগতে একেক দৈনিক পত্রিকা একেক বানান অনুসরণ করছে। বাংলার বানান 'ং' দিয়ে না 'ঙ' দিয়ে হবে? আমরা ভাঙচুর করব 'ং' নিয়ে না 'ঙ' দিয়ে? আমরা মধ্যপন্থী হব শেষে ই, না ঈ বেঁধে? দৈনিক *প্রথম আলো*তেও চন্দ্রবিন্দুবিদ্বেষীদের এক অভাবিত দুষ্প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ছত্রাকার ব্যবস্থা নিরসন করতে বাঙলা একাডেমী প্রমিত বানান স্থিরিকরণের জন্য যে-চেষ্টা করে তাও আমরা অনুসরণ করতে চাই না।

আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার যে ঘাটতি দেখা যায় তা কিছুটা পূরণের ক্ষেত্রে ভাষা প্রতিযোগ অনুষ্ঠান একটি অনবদ্য পদক্ষেপ। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগী, পরামর্শক, পৃষ্ঠপোষক ও অংশগ্রহণকারীদের আমি অভিনন্দন জানাই। এ-ধরনের উৎসব বাৎসরিক হোক এবং নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করুক, আমি এই কামনা করি।

আজ বাংলা ভাষা বিশ্বে ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। বহুভাষী লন্ডন শহরে বাংলা দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা। আজ সারা বিশ্বে বাংলাভাষীরা এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে, সব সময়-অঞ্চলে তাদের দেখা পাওয়া যায় এবং তাদের কল্যাণে আজ বাংলা ভাষার সূর্য আর অস্ত যায় না। মহাবিশ্বে মঙ্গলগ্রহে যে সৌর ঘড়ি পাঠানো হয়েছে সেখানে চব্বিশটি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষায় 'মঙ্গল' কথাটা লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি মমতায়, ভাষার খাতিরেই আমরা আমাদের অবহেলিত জয়ধ্বনিটা আবার সোল্লাসে উচ্চারণ করব। জয় বাংলা!

প্রথম আলো ২৪ এপ্রিল ২০০৫
এইচএসবিসি-প্রথম আলো ভাষা প্রতিযোগ ২০০৫-এর জাতীয় উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণ

হরফ নিয়ে হুজ্জত

মানবসমাজে ভাষা বা হরফ একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের বস্তু। নানান দেশের মানুষ তাদের বিশ্বাসে বা জিজ্ঞাসায় ভাষা বা হরফের প্রতি অতিপ্রাকৃত শক্তি আরোপ করে। নানা উপকথা-কল্পকথা রচিত হয়েছে। সমুদ্রের ঘোড়া কাছিম যখন চীনের রাজার সামনে হাজির হলো তখন তার পিঠের উপরকার আঁকিবুকি দেখে রাজার মনে হলো এ তো দারুণ হরফ! আবার পাখি যখন রাজাকে গান শুনিয়ে উড়ে গিয়ে বালুর উপর বসে, হাঁটে বা দৌড়ঝাঁপ করে তখন বালির ওপর তার পায়ের আঁচড়গুলো দেখে রাজার মনে হয় এগুলো তো হরফ হতে পারে। কী দিয়ে কিসের ওপর লেখা তা হরফের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। কাদা, মাটি, প্রস্তর, ধাতু, কলাপাতা, ভুর্জপত্র বা কাগজের ওপর যেসব লেখা হয় তাদের লিখন-সামগ্রীর জন্য লেখনভঙ্গি বা লিপির তারতম্য ঘটে।

লিপি বলতে লিখন বা লেখা, আবার অক্ষর বা বর্ণমালাও লিপি। যেমন, বাংলা অক্ষর বা বর্ণমালাকে বাংলা লিপি, সংস্কৃত ভাষার অক্ষর বা বর্ণমালাকে সংস্কৃত লিপি বলা হয়। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়ার মানুষ 'লেখা' শুরু করে। এর একটির উৎস নীলনদ এলাকার মিশর এবং আর-একটি ব্যাবিলনের ইরাক অঞ্চল। তখনকার লিপিকে অবশ্য আজকের মতো শব্দধর্মী না বলে প্রতীক বা চিত্র বলা উচিত। ক্রমে চিত্র ধ্বনিগুচ্ছ হয়ে ওঠে এবং ভাষায় রূপ নেয়। পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার আর মূল লিপির সংখ্যা একশোর মতো। অন্যান্য ভাষা এই লিপিসমূহেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র।

বর্ণমালার ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের একটি সম্ভ্রমবোধ রয়েছে। লেখা আছে না?—এই বলে লিখিত বক্তব্যের প্রতি পাঠকের আস্থা অর্জন করা হয়। লিখিত

দলিলের প্রামাণিকতা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা সাধারণত বিনষ্ট বা পরিবর্তন করা যায় না। একসময় হাতে লেখাকে মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত লেখার ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হতো। কোরানশরিফ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে এটা মুসলমান সমাজে বহুদিন ধরে সমর্থন লাভ করেনি। ১৮২৫ সালে খলিফা কোরান-মুদ্রণের অনুমতি দেন।

সাইফার বা গুপ্ত সাংকেতিক লিপির মাধ্যমে গোপন বা কূটনৈতিক যোগাযোগ করা হয়ে থাকে। সাইফারের সঙ্কেত জানা না থাকলে সাইফারে লিখিত বার্তার মর্মোদ্ধার করা যায় না।

জাতীয়তাবাদ বা অন্য কোনো আদর্শের অনুপ্রেরণা বা নিছক প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বের নানা জায়গায় হরফ নিয়ে হুজ্জত লেগেই আছে। একটি চমকপ্রদ উদাহরণ আজারবাইজান।

গত একশো বছর ধরে সেখানে হরফ নিয়ে যে-পিড়পড় খেলা হয়েছে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি মর্মন্তুদ। বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের পূর্বে প্রায় ১৩শো বছর ধরে আজারবাইজানে ফারসি হরফের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত আরবি হরফ চালু ছিল। বিশ দশকের শেষে দেশে সাক্ষরতা আন্দোলনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য লাতিন হরফ প্রবর্তন করা হয়। পেছনে আরও কিছু গূঢ় কারণ ছিল বলে অনুমান করা হয়। ওই অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব সীমিত বা সঙ্কুচিত রাখার জন্য এবং সোভিয়েত তুর্কি প্রজাতন্ত্রগুলো যেমন কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান ও অন্যান্য ছোট ছোট তুর্কিভাষী তাতারের মতো জনজাতিগুলো যেন নিজেদের মধ্যে কোনো সংহতি বা মৈত্রী সংগঠনের মাধ্যমে সোভিয়েত সার্বভৌমত্ব বা প্রাধান্যের কোনো ক্ষতিসাধন না করতে পারে সে-চিন্তাও ছিল লাতিন হরফ প্রবর্তনার পেছনে।

সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই আন্দোলনকে ইসলামের প্রভাব হ্রাসের বড় সহায়ক মনে করে। ১৯২৬ সালে বাকুতে প্রথম আন্তর্জাতিক তুর্কিতত্ত্বের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় লাতিন হরফকে তুর্কিভাষীদের সাধারণ ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।

১৯২৮ সালে তুরস্ক লাতিন বর্ণমালা গ্রহণ করে। দুই বৎসরের মধ্যে সকল তুর্কি প্রজাতন্ত্র লাতিন বর্ণমালা চালু করে। এই সময় নতুন বর্ণমালা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত নারীবাদী আন্দোলনের স্লোগান 'চাদর নিপাত যাক' ধ্বনিত হয়। নারী-প্রগতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ৯৮ শতাংশ সাক্ষরতা বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে যাঁরা লাতিন বর্ণমালা সম্পর্কে বাকু কংগ্রেসে সোচ্চার হন তাঁরা স্তালিনের বিরাগভাজন হন। অনেকে নিখিল তুর্কবাদ প্রচারের জন্য নির্বাসিত হন, অনেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্তালিন আশঙ্কা করেন ব্যাপক লাতিন হরফের চল তুর্কিভাষীদের মধ্যে এমন ঐক্য গড়ে তুলবে যা সোভিয়েত প্রাধান্য ক্ষুণ্ন করবে। ১৯৩৭ সালে স্তালিন সকল তুর্কি প্রজাতন্ত্রের জন্য সিরিলিক বর্ণমালা বাধ্যতামূলক

করেন। স্তালিনের জন্মস্থান জর্জিয়া ও তাঁর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা মিকোইয়ানের দেশ আর্মেনিয়ায় চালু বর্ণমালা অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত তুর্কি প্রজাতন্ত্রগুলোতে লাতিন বর্ণমালার পরিবর্তে রুশ ভাষায় ব্যবহৃত সিরিলিক বর্ণমালা চালু করা হয়। জ্বালানি তেল-উৎপাদন প্রবৃদ্ধির সময় গত শতাব্দীর নব্বই দশকে হরফ বিষয়টা বিশেষ পর্যালোচনা করা হয় এবং ভাবা হয় আজারবাইজান ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে একেবারে নতুন একটি লাতিন বর্ণমালা তৈরি করা যায় কি না। যখন ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে এবং আজারবাইজান স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন ডিসেম্বর ১৯৯১ খুব স্বাভাবিকভাবেই লাতিন বর্ণমালা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি, বিশেষ করে স্বরবর্ণের সিরিলিক হরফের জন্য, আজারবাইজানিদের কাছে তাদের পরিচিত ভাষা উজবেক, তুর্কমেন বাসকিরিন বা চুভাল ভাষায় লিখিত কোনো কোনো শব্দ কিছু দুষ্পাঠ্য হয়ে গেল। তুর্কি জাতিসমূহের একত্রকরণের সম্ভাবনা হলো সুদূরপরাহত। সিরিলিক বর্ণমালা এমন একটি শ্রীহীন বর্ণমালা যার 'sh', 'i', 'm', 't' যখন পরপর লেখা হয় তখন তাদের চেনা দায় হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ লোক হঠাৎ করে অশিক্ষিত হয়ে গেল। বয়স্কদের পক্ষে নতুন হরফ আয়ত্ত করা বেশ দুরূহ হয়ে পড়ল। রাতারাতি হরফ বদলালে যা হয় তা-ই হয়েছে সম্প্রতি আবার লাতিন বর্ণমালার প্রত্যাবর্তনে। প্রত্যেকবার বর্ণমালার পরিবর্তনে জাতীয় ঐতিহ্যের এক মূল্যবান অংশ হারিয়ে যায় বা দুর্গম হয়ে পড়ে। লাতিন হরফের জন্য আরবি ঐতিহ্য এবং সিরিলিক হরফের জন্য লাতিন ঐতিহ্যে তোলপাড় চলে। কারো কারো ক্ষেত্রে এক জীবদ্দশায় চার-চারবার—আরবি-লাতিন-সিরিলিক-লাতিন হরফের পরিবর্তন ঘটে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পূর্বের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটা ভাষাভিত্তিক পুনরুজ্জীবন ঘটে। আর্মেনিয়া, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং ইউক্রেনে মাতৃভাষার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়। মধ্য-এশিয়ার আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান পূর্বের রুশ প্রভুদের সিরিলিক বর্ণমালা ত্যাগ করে তুর্কি জ্ঞাতিগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত পশ্চিমা বর্ণলিপি গ্রহণ করে। তাজিকিস্তান আরবি বর্ণমালা বেছে নেয়।

পূর্বের যুগোস্লাভিয়ার সার্বরা তাদের সার্ব-ক্রোয়েশিয়ান ভাষাকে শুধু সার্ব ভাষা বলতে শুরু করে এবং রুশ জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের সিরিলিক বর্ণমালা গ্রহণ করে। ক্রোটরা তাদের ভাষাকে শুধু ক্রোয়েশিয়ান বলতে শুরু করে এবং তুর্কি ও বিদেশী শব্দ বিতাড়ন করার জন্য এক শুদ্ধি আন্দোলনে তৎপরতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে বসনিয়ানরা তাদের ভাষায় আরবি ও তুর্কিভাষার শব্দকে আত্তীকৃত করার চেষ্টা করে।

তুর্কি ভাষা থেকে আরবি ও ফারসি শব্দকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে শুদ্ধ তুর্কি ভাষা নির্মাণের জন্য সূর্য-ভাষাতত্ত্বের অবতারণা করেন কামাল আতাতুর্ক। আরবি-

ফারসি শব্দ অপরিহার্যভাবে তুর্কি ভাষায় যখন রয়ে গেল তখন আবার বলা হলো সূর্য-ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী তুর্কি হচ্ছে মানবসমাজের আদিতম ভাষা এবং যেসব অপরিহার্য বিদেশী শব্দ তুর্কি ভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো মূলে তুর্কিই ছিল।

বাংলায় পর্তুগিজ মিশনারি মানোয়েল দ্যা আস্‌সুম্পসাওয়ের ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* বইটিই সম্ভবত সে-সময় ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার রোমান লিপিতে ছাপা বাংলা ভাষার প্রথম বই। উইলিয়াম জোনস ১৭৮৮ সালে রোমান বর্ণমালায় সংস্কৃত ভাষা লেখার পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষার অভিধানকার মনিয়ের উইলিয়াম্‌স্ সেই বর্ণমালার নাম দেন 'ইন্দো-রোমানিক স্ক্রিপ্ট'। চব্বিশ পরগনা জেলার বিচারক জে. এফ. ব্রাউন রোমান বর্ণে বাংলা লেখার জন্য 'রোমান অক্ষর সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ সালে *দুর্গেশনন্দিনী* বইটি রোমান অক্ষরে মুদ্রণের জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মতিও আদায় করেন। ১৯১০ সালে রেভারেন্ড জে. নোলস রোমান লিপি প্রবর্তনের একটি সর্বভারতীয় পরিকল্পনা করেন। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্কার-প্রস্তাবও ১৯১৮ সালের দিকে চূড়ান্ত রূপ পায়। রোমান হরফ প্রবর্তনের জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৫ সালে একটি প্রস্তাব দেন। কিন্তু এসবের কোনোটিই জনসাধারণ্যে কিংবা শিক্ষিতসমাজে গৃহীত হয়নি।

১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন বয়স্কদের শিক্ষার জন্য রোমান হরফের সুপারিশ করে। ১৯৫৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রধান সামরিক শাসনকর্তা আয়ুব খান সব ভাষার জন্য রোমান হরফ এবং একটি সাধারণ ভাষার জন্য প্রস্তাব দেন। আমাদের দেশের ড. কুদরত-ই-খোদা ও অধ্যক্ষ আবু সুফিয়ানের মতো কয়েকজন শিক্ষাবিদ রোমান হরফের পক্ষে সমর্থন জানান। ১৯৬৮ সালের ৩১ আগস্ট ৪১ জন সাহিত্যিক ও শিল্পী একটা যৌথবিবৃতি দিয়ে মন্তব্য করেন, 'বাংলা হরফের রদবদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে।'

বাংলার জন্য রোমান হরফ গ্রহণ করলে কয়েকটি নতুন চিহ্ন সৃষ্টি করতে হবে এবং তাতে মোট অক্ষর-সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে চল্লিশে। বর্তমানে বাংলা যে ৫১টি অক্ষর এবং রেফ, র-ফলা, য-ফলা আরো তিনটি চিহ্ন রয়েছে তা এমন কিছু কমবে না। আধুনিক চীন ও জাপানে বর্ণমালার সংস্কার না করেই আধুনিক হয়েছে। রোমান হরফে লিখন ও পঠন-দ্রুতি বাংলার চেয়ে বেশি একথাও ঠিক নয়। লিখন-দ্রুতির পরিমাণ অক্ষর-সংখ্যার হিসেবে ধরা ঠিক হবে না, ধ্বনি-মাত্রার হিসেবে ধরতে হবে। বাংলা হরফের পক্ষে বলা হয়, এ-বর্ণমালা ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত, হরফ লেখার সঙ্গে সঙ্গে লিখনও শেখা হয়ে যায়। ধ্বনি-প্রকাশের কৌশল আয়ত্ত করা বাংলা হরফে নাকি রোমান হরফের চেয়ে শ্রেয় ও সুবিধাজনক। রোমান হরফ গ্রহণ করলে অক্ষরযোজনার পন্থা নতুন করে শিখতে হবে। আগ্রহশীল বিদেশীর পক্ষে পনেরো দিনে বাংলা হরফ আয়ত্ত করা সম্ভব।

বিদেশীদের সামান্য সুবিধার জন্য আমাদের নিজস্ব হরফ বিসর্জন দেওয়া কি মোটেও সমীচীন হবে? নতুন হরফের জন্য যে-উদ্যম, আয়োজন ও অর্থের প্রয়োজন হবে তা অযথার্থ হবে।

চীনে ভাষাসংস্কারের ক্ষেত্রে রোমান হরফ নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যালোচনা করার পরে সেই হরফ গ্রহণ করা হয়নি। বিশেষ করে কম্পিউটার-কৌশল আবিষ্কারের পর হরফ-পরিবর্তনের প্রশ্নটা এখন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত কালে পূর্ব পাকিস্তানে আরবি বা উর্দু হরফ প্রচলনের একটা চেষ্টা চলে। মুসলমান লেখকদের কিছু লেখা—যেমন আলাওলের *পদ্মাবতী*—আরবি বর্ণসংকেতে বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হয়। যখন আরবি হরফে বাংলা লেখার আন্দোলন হয় তখন চট্টগ্রাম হতে হরফুল কোরআন নামক একটা সাময়িক পত্রিকা আরবি বর্ণ-সংকেতে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আরবি হরফে সমর্থন ছিল। সরকার বেশ কিছু অর্থও ব্যয় করে। নয়-দশ বছর পরে দেখা গেল, তেমন কোনো কাজ হয়নি। প্রাথমিক উদ্যম অপচয়ে পর্যবসিত হলো। রোমান হরফের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়, রোমান হরফে অক্ষর-সংখ্যা কমবে, নিরক্ষরতা দূর করা সহজ হবে, টাইপরাইটারের সুবিধা হবে। আমাদের পক্ষে ইংরেজি শেখা ও বিদেশীদের পক্ষে বাংলা শেখা সহজতর হবে।

বাংলাদেশে ইংরেজি, দেবনাগরী, নাগরী ও বাংলা ছাড়াও আরো দু-তিনটি স্বল্পব্যবহৃত লিপি রয়েছে। মায়ানমারের লিপির প্রভাব রয়েছে রাখাইন ভাষায়। বম ও গারোদের ভাষা রোমান হরফে লেখা হয়।

সাঁওতালি ভাষার বাংলা বা হিন্দি ভাষার সঙ্গে কোনো মিল নেই। এই ভাষার কোনো বর্ণমালা ছিল না বলে বাংলা, হিন্দি ও রোমান প্রভৃতি বর্ণমালার সাহায্যে এই ভাষা লেখা হতো। পঞ্চাশ বছর আগে এই ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। পঁচিশ বছর আগে সাঁওতালরা একটা নতুন বর্ণমালা 'অলচিকি'র উদ্ভব ঘটিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সেই অলচিকি বর্ণমালাকে সাঁওতালি ভাষার বর্ণমালা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশে রোমান ও বাংলা লিপিতে সাঁওতালি লেখা হয়। এক বাংলা লিপিতে দুটো ভাষা শেখা ও বাংলায় লিখিত বইপত্রের সোজাসুজি ব্যবহারের সুবিধার্থে বাংলা বর্ণমালায় সাঁওতালি বই বেশ লেখা হচ্ছে। তবে অনেক সাঁওতালের মনে কিছুটা অসন্তোষ রয়েছে। আমাকে একজন শিক্ষিত সাঁওতাল মহিলা বলেন, 'বাংলা বর্ণমালায় কোনো কোনো অক্ষর/শব্দের উচ্চারণে সাঁওতালি ভাষার স্বকীয়তা ও স্বচ্ছন্দ উচ্চারণের মাধুর্য বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' ব্যবহারে ও যথার্থ প্রশিক্ষণের ফলে ভাষার স্বাভাবিক সুষমা ফিরে পাওয়া বা রক্ষা করা যেতে পারে।

হরফের প্রতিবর্ণীকরণ ও লিপ্যন্তরণে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। প্রতিবর্ণীকরণের মূল হচ্ছে প্রত্যেক অক্ষর একটি বা একাধিক ক্যারাকটার দ্বারা বর্ণিত হয়। উত্তম প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতিতে প্রতিটি অক্ষরের পালটা অক্ষর থাকবে। চীনা, জাপানি ও আরবি ভাষার অর্থপ্রকরণ এতই জটিল যে প্রতিবর্ণীকরণে বেশ অসুবিধা হয়।

২৬টি রোমান হরফের মাধ্যমে সংস্কৃত শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ কঠিন ব্যাপার। এক ভাষায় এমন সব অক্ষর থাকে যা অন্য ভাষায় প্রতিবর্ণীকরণ করা কঠিন। ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে ডায়াক্রিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করে রোমান হরফে প্রতিবর্ণীকরণ অনেক সহজ হয়েছে। আরবি নাম রোমান হরফে লেখার সময় জটিলতা সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক সর্বজনস্বীকৃত মান নেই। বিশেষ করে যেসব অক্ষর শ্বাসরন্ধ্র সম্পূর্ণ বন্ধ করে উচ্চারণ করতে হয় তাদের সমধ্বনিমূলক অক্ষর রোমান হরফে নেই। সাধারণ আরবি নামের বিভিন্নভাবে বানান করা হয়েছে। গুগল দেখিয়েছি মুহাম্মদ ৪১%, মোহাম্মদ ৩২%, মোহামেদ ২৫% এবং মাহোমেট ৩%। বিন্ লাদেনের শিষ্যদের হদিস জানার জন্য তাদের আরবি নামের রোমান প্রতিবর্ণীকরণে অনেক অসুবিধা হচ্ছে তথ্য-সরবরাহকারীদের জন্য। একই আরবি শব্দ রোমান হরফে তার ধ্বনিগতভাবে লিখিত হলেও মরক্কো, মিশর ও সৌদিআরবের লোকজন তা বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করছে।

মার্কিন লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস ও মার্কিন লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশান রোমান হরফে প্রতিবর্ণীকরণের জন্য ১৫০টিরও ভাষার সারণি তৈরি করেছে। রোমান হরফের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত বিন্দু, রেখা ও অন্যান্য চিহ্ন প্রতিবর্ণীকরণ কঠিন।

ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্র ও পুস্তকের ভাষা হিব্রু বর্তমানে ইসরায়েল রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা। অন্যান্য সেমিটিক ভাষার মতো এই ভাষা ডানদিক থেকে বামে লেখা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিব্রু ভাষার পুনর্জাগরণ ঘটে। যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টান আরবি উপভাষা ব্যবহার করেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে অঞ্চল বা সম্প্রদায়ভেদে অন-আরবি বর্ণমালা ব্যবহার করেন, যেমন ইহুদি-আরবিতে হিব্রু, গারশুনি-আরবি সিরীয় এবং মাল্টা-আরবিতে রোমান হরফ।

আজকাল জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বহু প্রচলিত ভৌগোলিক নাম রোমান হরফে নতুন বা পরিবর্তিত আকারে লেখা হচ্ছে। যেমন—ঢাকা, কলকাতা ও মুম্বাই। ভৌগোলিক নাম-সংক্রান্ত জাতিসংঘ বিশারদগণ গত ত্রিশ বছর ধরে স্থান ও নামের বানান মানসম্মত করার যে-চেষ্টা করেছেন তা বেশ সফল হয়েছে। সিজেকে ডিকশনারি ইনস্টিটিউট (CJK Dictonery Institute) ট্রান্স (TRANS) ছকের সাহায্যে যে-কোনো যুগল ভাষায় এমনকি জটিল বানানের আরবি, হিব্রু বা চীনা ভাষায় মোটামুটি প্রতিবর্ণীকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

ভাষাপ্রেম ও ভাষাবৈরিতা

মানুষ মিল খোঁজে, মানুষ ফারাক টানে। ভাষা, ধর্ম, জ্ঞাতি বা জাতি যেমন মানুষকে মেলায় তেমন মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। ভাষার সম্পর্ক একদিক থেকে ধর্মের সম্পর্কের চেয়েও নিবিড়। বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ধর্মের মিল থাকলেও তা ভাষার কারণে আলাদা হয়ে যায়।

ভাষানুগত্য মধ্যযুগে তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়নি। যেখানে রাজানুগত্যে রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকত সেখানে রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই ছিল যথেষ্ট। প্রজাদের বহুভাষী হতে কোনো ব্যত্যয় দেখা দিত না। এমনকি প্রজার ভাষা রাজার না জানলেও চলত। তবে যেকোনো রাজা বা প্রশাসনের এটা তো এক একান্ত ইচ্ছা যে, তাঁর ভাষা, তাঁর ধর্ম বা তাঁর আইন প্রজা মেনে চলবে। যা-ই হোক, জাতীয়তাবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ঐক্য ও ভাষার প্রতি আনুগত্য বড় হয়ে দেখা দেয়।

রুশো বলতেন, রাজনীতির সম্ভাব্যতার পূর্বেই ভাষার বিকাশ ঘটতে হবে। ফরাসি বিপ্লবের পর আঞ্চলিক সব ভাষা প্রভঁসল, ব্রতঁ বা বাস্ক আত্মীকৃত করে ইল দ্য ফ্রঁসের ফরাসি দেশের একমাত্র মানভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ভাষানুরাগীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রেমান্ধ বোধহয় ফরাসিরা। খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ-ব্যাপারে কেউ কম যায় না। একজন বাংলাভাষী আর-একজন বাংলাভাষীর সঙ্গে যে কী প্রেমে একাত্ম বোধ করে তা বিদেশে গেলে বেশ বোঝা যায়।

আমাদের দেশে ফারসি যখন রাজভাষা ছিল তখন একটা প্রবাদের জন্ম দেয়, 'ফারসি পড়ে যে জামাই তার থেকে ভালো নাই।' তবে বিদেশী ভাষার সম্পর্কে একটা বিরূপ ভাবও ছিল। সংস্কৃতের যুগে বলা হতো—'অনুস্বর দিলে যদি সংস্কৃত হয়/তবে কেন রামসুন্দর মাচার তলে রয়।' বর্গির হামলার যুগে লোকে

বলত—'বাঙালি কুত্তার মারহাট্টা রাও।' আরবি ভাষা নিয়ে অহঙ্কার করলে যেমন বলা হতো—'বাঙালির পুত আরবি কয়/'আব আব' কইরা তার মরণ হয়,' তেমনি ইংরেজিপনার প্রতি কটাক্ষ করে বলা হতো—'কোন দেশে গেলি ব্যাটা ওয়াটার গিলে এলি,/ওয়াটার ওয়াটার করে বেটা পানির লেগে মরলি।'

কোনো কোনো মুসলমান ভাবতে পারেন আরবি আল্লাহর ভাষা। আসলে সব ভাষাই আল্লাহর। যেমন সব মানুষই আল্লাহর সৃষ্ট। কোরানে বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য আল্লাহর নিদর্শন।' আরো বলা হয়েছে, 'যাতে স্পষ্ট করে বয়ান করা যায় তার জন্য তিনি প্রত্যেক রসুলকে তার স্বজাতির ভাষা দিয়েই প্রেরণ করেছেন।' 'মক্কায় ও তার আশপাশে যারা বাস করে তাদের যাতে রসুল সতর্ক করতে পারেন তার জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি আরবি ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করেছেন।'

ইহুদিরা ভাবত স্বর্গের ভাষা হিব্রু। সংস্কৃতের অপর নাম দেবভাষা এবং সে-ভাষা শোনারও অধিকার ছিল না কোনো শূদ্রের। অসতর্ক শূদ্রের কর্ণে তা প্রবেশ করলে তার কর্ণদ্বয় তপ্ত সিসা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার একসময় নাকি বিধান ছিল। কর্তৃত্ববাদী ধর্মের অধিকারীরা বিভিন্ন দেশে ভাষাবৈরিতা সৃষ্টি করেছে। ইউরোপে লাতিন ও ভার্নাকুলারে, ইরানে আরবি ও ফারসিতে এবং ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে শুদ্ধবাদীদের বৈরিতা ছিল প্রকট। মাতৃভাষার অধিকার আজ সংস্কৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবাধিকার হিসেবে গণ্য বলে ভাষাবৈরিতা তেমন প্রকট না হলেও প্রচ্ছন্ন বৈরিতা জাতিগত বৈরিতার সঙ্গে সহাবস্থান করছে।

সাধারণত পরভাষা বা পরসংস্কৃতির প্রতি মানুষের একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি থাকে। পরভাষীদের জন্য নানারকম নামকরণ হয়। হিন্দুরা মুসলমানদেরকে যখন যবন বা নেড়ে বলে বা যখন মুসলমানরা হিন্দুদেরকে কাফের বা মালাউন বলে এবং আমরা অবাঙালিদের যখন উড়ে, মেড়ো, বিহারি, খোট্টা, কাবলি বা পাকিস্তানি বলি তখন একধরনের বিরাগ প্রকাশ পায়। ইউরোপে ফরাসিরা জার্মানদের হুন বলে। ফরাসিরা জার্মানদের কাছে তেলাচোরা। একজন চেকের কাছে একজন হ্যাঙ্গেরিয়ান দুষ্টব্রণ। ফরাসিদের কাছে স্পেনীয়রা উকুন।

ভাষার আত্মীকরণে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন, দেশের প্রধান ভাষা বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা সকলের শেখা উচিত, ঘরে সে যে-ভাষাতেই কথা বলুক-না কেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় জার্মান ভাষার বেশ প্রভাব ছিল। কেউ-কেউ বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ভাষা জার্মান করা হোক। জার্মান ভাষার বিরুদ্ধে কয়েক দশক আগে থেকে কিন্তু কিছু বিরূপ মন্তব্য করা হচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম স্থপতি-পিতা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০) ১৭৫৩ সালে বলেন যে, 'জার্মান অভিবাসীরা ইংরেজি শিখছে না। জার্মান জাতির মধ্যে যারা সবচেয়ে বুদ্ধিহীন তারাই আসছে আমেরিকায় ... সংখ্যায় তারা

শিগগির আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাবে এবং আমার মনে হয় আমাদের সব সুবিধাসত্ত্বেও আমরা আমাদের ভাষাকে সংরক্ষণ করতে পারব না এবং আমাদের সরকার এক নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়বিংশতিতম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট (১৮৫৮-১৯১৯) বলতেন তাঁর দেশে, 'কেবল একটি ভাষার স্থান রয়েছে এবং তা হচ্ছে ইংরেজি ... আমাদের একটিই পতাকা থাকতে হবে। আমাদের ভাষাও একটি থাকতে হবে। সেই ভাষা হবে স্বাধীনতার ঘোষণার ভাষা, ওয়াশিংটনের বিদায়-ভাষণের ভাষা, লিনকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতার ভাষা এবং তাঁর দ্বিতীয় উদ্বোধনীর ভাষা।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সরকারি ভাষার কোনো উল্লেখ নেই। ২৩টি অঙ্গরাজ্যে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করা হয়েছে। আরিজোনার 'কেবল ইংরেজি'র আইন সেই রাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য নাকচ করে দিয়েছে। প্রত্যেক অভিবাসীকে ইংরেজিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হয়। গুয়াম দ্বীপে চামোরা ভাষার কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল ১৯৭৩ পর্যন্ত। অধিকৃত ফিলিপাইন ও পোর্টোরিকোতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই নীতি অনুসরণ করা হতো। ফ্রান্স তার সীমান্তের অভ্যন্তরে কেবলই ফরাসি—এই নীতি অনুসরণ করে আসছে। মেসিডোনিয়ায় গ্রিককরণ ও সোভিয়েত রাশিয়ায় রুশীকরণের নীতি চালু ছিল।

দুই বা একাধিক ভাষা সরকারি মর্যাদা পেয়ে আসছে অনেক দেশে। কানাডা ও ক্যামেরুনে ইংরেজি ও ফরাসি; বেলজিয়ামে ফরাসি ও ফ্লেমিশ; সুইজারল্যান্ডে ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান ও রোমানস; সিঙ্গাপুরে ইংরেজি, মালয়, তামিল ও চাইনিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজি ও আফ্রিকান ছাড়া আরো আটটি সরকারি ভাষা।

অতিমাত্রায় ভাষাপ্রেম ভাষাবৈরিতার জন্ম দিতে পারে। রবার্ট বার্চফিল্ড তাঁর দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ গ্রন্থে বলছেন, 'মেধাশক্তি ও বিনোদনের উৎস হিসেবে সমগ্র ইংরেজি গদ্যরচনার সমকক্ষ হয়তো পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।' তিনি যদি চীনা, জার্মান বা রাশিয়ান হতেন তবে তিনি তাঁর মাতৃভাষার ব্যাপারে হয়তো অনুরূপ কথাই বলতেন। চীনা ভাষা তো গত আড়াই বছর ধরে জ্ঞানে-গরিমায়-গৌরবে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে এবং প্রতিবেশী জাপানি, কোরিয়ান ও ভিয়েতনামের ভাষাকে প্রভাবান্বিত করছে।

ফরাসিদের ধারণা, যা পরিষ্কার বা সুস্পষ্ট নয় তা ফরাসি নয়। জার্মানরা ভাবেন তাঁদের ভাষায় একধরনের অন্তর্নিহিত মরমি শক্তি আছে, যার জন্য তাঁদের ভাষা এত পরিষ্কার। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে একসময় জার্মান ভাষার বেশ চল ছিল। ইতালিয়ানরা তাদের ভাষার অন্তর্নিহিত সঙ্গীত নিয়ে মশগুল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতে পারে।

যেখানে একাধিক ভাষা নিয়ে সংঘর্ষ বাধে সেখানে প্রত্যেকটি ভাষাই সরকারি কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষাঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। যেখানে দুটো ভাষা সমানভাবে প্রচলিত সেখানেও নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন বেলজিয়ামে অনেক শহরের দুটো নাম : একটি ফরাসি এবং অন্যটি ফ্লেমিশ ভাষায়। ভাষার দাবিদাওয়া নিয়ে সেদেশে সরকারের পতন ঘটেছে এমন নজির রয়েছে। ভাষা নিয়ে অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব চলেছে কানাডায়।

কানাডার কুইবেক প্রদেশের কেবল ফরাসি ভাষায় আইন কানাডার সর্বোচ্চ আদালত বাতিল করে দেয়। কানাডিয়ান চার্টারের ১৬(১) ধারা বলে কানাডার দুটো সরকারি ভাষা, ইংরেজি ও ফরাসি। উভয় ভাষায় যাতে সকলে সমান মর্যাদা, সমান অধিকার ও সমান সুবিধা পায় সে-ব্যাপারে কানাডার সরকার বেশ যত্নবান।

অনেক সময় একটি ভাষাকে সীমিত বা নিষিদ্ধ না করে বা উৎসাহ না দিয়ে সহ্য করা হয়। যেমন উত্তর আমেরিকায় আমেরিভিয়ানদের ভাষা, পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্ন ভাষাভাষী অভিবাসীর ভাষা এবং ফ্রান্সে বাস্ক ভাষা। অনেক সময় কোনো কোনো ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রিসে মেসিডোনিয়ান, ১৭৪৫ সালের অভ্যুত্থানের পর স্কটল্যান্ডে গেইলিক ভাষা, উত্তর আমেরিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের ভাষা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চ্যানেল আইল্যান্ডে নরম্যান-ফ্রেঞ্চ উপভাষা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। স্বাধীন লিথুয়ানিয়া পোলিশ ভাষার ব্যবহার সীমিত করতে চায়। এস্তোনিয়ায় নাগরিকত্বের জন্য এস্তোনিয়া ভাষার জ্ঞান আবশ্যিক করা হয়েছে। মলডেভিয়ায় তর্ক উঠেছে মলডেভিয়ান ভাষা রোমানিয়ান না রাশিয়ান। আগে মলডেভিয়ানদেরকে তাদের ভাষা সিরিলিক লিপিতে লিখতে রাশিয়ানরা পীড়াপীড়ি করত, বোঝাতে চাইত যে মলডেভিয়ান রোমানিয়ান ভাষা নয়।

তুরস্কে তুর্কি ভাষা থেকে আরবি ও ফার্সি শব্দকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে শুদ্ধ তুর্কি ভাষা নির্মাণের জন্য সূর্য-ভাষাতত্ত্বের অবতারণা করেন কামাল আতাতুর্ক। সূর্য-ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী তুর্কি হচ্ছে মানবসমাজের আদিতম ভাষা এবং যেসব অপরিহার্য বিদেশী শব্দ তুর্কি ভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মূলে নাকি তুর্কিই ছিল।

যুগোস্লাভিয়ার সরকারি ভাষা ছিল সার্বো-ক্রোয়েশিয়ান। সার্বিয়ান ও ক্রোয়েশিয়ান ভাষাভাষীদের কাছে উভয় ভাষা সহজে বোধগম্য ছিল। সার্বিয়ান লেখা হতো সিরিলিক হরফে। সেই ভাষায় ইস্টার্ন অর্থডক্স, রাশিয়ান সংস্কৃতি এবং প্রাচীন চার্চ স্লাভিকের প্রভাব বেশি। পক্ষান্তরে, ক্রোয়েশিয়ান রোমান হরফে লেখা এবং রোমান ক্যাথলিক ও জার্মান সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৯১ সালে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার ওপর জোর দিতে গিয়ে সার্বিয়া যেসব প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছিল তার সর্বাগ্রে ছিল সিরিলিক হরফে লেখা সার্বিয়ানকে দেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া। আগের সার্ব-ক্রোয়েশিয়ান ভাষা শুধু সার্ব নামে চালু হলো।

ক্রোটরা তাদের ভাষাকে এখন শুধু ক্রোয়েশিয়ান বলে। তুর্কি ও বিদেশী শব্দ বিদায় দেওয়ার জন্য এক শুদ্ধি আন্দোলনে তারা তৎপর। অন্যদিকে বসনিয়ানরা তাদের ভাষায় আরবি ও তুর্কি ভাষার শব্দ অন্তর্ভুক্ত ও আত্মীকৃত করতে চায়।

চেক ও স্লোভাক দুটো ভাষার মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও স্ব স্ব ভাষার প্রতি প্রেমাধিক্যে চেকোস্লোভাকিয়া ভাগ হয়ে গেল। হাসপাতালে ডাক্তারদের স্লোভাক ভাষায় কথা বলতে হবে, রোগীর মাতৃভাষা ভিন্ন হলেও। সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট স্কুলে অন্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হলেও শিক্ষকদের স্কুলের নীতিনির্ধারণী সভায় স্লোভাক বলতে হবে। চার্চের বিবাহ-উৎসবেও স্লোভাক ভাষা ব্যবহার করার ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপের চেষ্টা হয়।

ভাষা নিয়ে অসহিষ্ণুতার শেষ নেই। কুইবেকে ফরাসিভাষীদের অসহিষ্ণুতা একসময় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ফরাসি ভাষায় লেখা না থাকার জন্য ক্রিসমাসের গিফ্‌ট-প্যাকেট ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবার ইউরোপের দ্বিভাষী তিরল অঞ্চলে একসময় কবরের স্মৃতিফলকের ভাষা পালটিয়ে দেওয়া হতো।

কোনো ভাষার গুণ-বিচার করার জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো মানমাত্রা বা মানাদর্শ নির্দিষ্ট করা কঠিন। কোনো ভাষাকে নিম্নতর বা উচ্চতর অথবা আদিম বা বিদগ্ধ বলা মুশকিল। প্রত্যেক ভাষার রয়েছে এক বা একটি অনন্য ভাষাপরিবেশ। কোনো ভাষা বা উপভাষাকে অপর একটা ভাষার চেয়ে ভালো বা মন্দ বলা যায় না।

ভাষার প্রতি মানুষের অনুরাগ এমনই গভীর যে, ভাষার ব্যবহারে সামান্য পরিবর্তনের প্রস্তাব উঠলে ধুন্ধুমার কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নরওয়ে, কানাডা ও বেলজিয়ামে এমন অবস্থা আমরা লক্ষ করেছি। কোনো-একটি ভাষার প্রতি অনুরাগ অত্যন্ত গভীর হলেও বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে যোগাযোগের ভাষার জন্য অনেক দেশ তার ভাষার দ্বারস্থ হয়েছে। বহুভাষী ভারতের পক্ষে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা রাখা ছাড়া উপায় নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আর্মেনিয়া, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং ইউক্রেনে মাতৃভাষার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। মধ্য-এশিয়া, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান পূর্বের রুশ প্রভুদের সিরিলিক বর্ণমালা ত্যাগ করে তুর্কি জ্ঞাতিগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত লাতিন বর্ণলিপি গ্রহণ করেছে। তাজিকিস্তান আরবি বর্ণমালা বেছে নিয়েছে।

ভাষাপ্রেম ও ভাষাবৈরিতার বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ আমরা লক্ষ করেছি গত ১০০ বছর ধরে। আগ্রাসী মানুষের ভাষার প্রতাপ ও প্রভাবে, অবজ্ঞায় ও অব্যবহারে গত ৩০০ বছরে কয়েকশো ভাষা হারিয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রায় ৬

হাজার ভাষার মধ্যে প্রায় অর্ধেকসংখ্যক ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। প্রতি দুই সপ্তাহে নাকি একটি ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

প্রত্যেকটি ভাষার একটি নিজস্ব বিশ্ব-ধারণা রয়েছে। প্রত্যেকটি ভাষাই আমাদের এক অমূল্য ধন। উন্নয়নের পথে একে বাধা বা বিঘ্ন হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। একটা ভাষাকে অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করে অবজ্ঞা করা যায় না। গত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শেষোক্ত মতটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিবিধ আন্তর্জাতিক দলিলে তা প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমানে মানবাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে পরধর্ম ও পরভাষার প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করার একটা চেষ্টা হচ্ছে। ভাষাবিদদের সঙ্গে সমস্বরে আজ অনেকেই বলছে, 'ভাষার নীহারিকাপুঞ্জের প্রতিটি বর্ণ এক-একটি উজ্জ্বল তারকা।'

১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার অঙ্গীকার চুক্তির ২৭ ধারায় বলা হয়, যেসব রাষ্ট্রে জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু রয়েছে সেইসব সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা যেন তাদের সংস্কৃতি উপভোগের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মের অবলম্বন পালনে বা প্রচারে বা তাদের ভাষার ব্যবহারে বঞ্চিত না হয়।

১৯৯২ সালের জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের অধিকারের ঘোষণায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং তাদের স্বারূপ্যের উন্নয়নের জন্য তৎপর হবে এবং তার জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন বা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯৯৫ সালের আদিবাসীদের অধিকারসমূহের খসড়া ঘোষণায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধিতে যে অবদান রাখে তা মানবজাতির এক সাধারণ উত্তরাধিকার।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আমাদের দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৯। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের মতে সেই সংখ্যা হবে ৪৫। তবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একই ভাষা ব্যবহার করে বলে মোট ভাষার সংখ্যা হবে ৩০টি। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বের প্রতিটি জনগোষ্ঠী নিজ ভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারী। এই সনদ বাংলাদেশ সই করেছে এবং ১৯৯৭ সালে, এ-ব্যাপারে সংসদে আইনও পাশ করা হয়েছিল। অর্থানুকূল্যের অভাবে এবং সব ভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক না থাকায় সেই আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ভাষা-সমস্যার কারণে শিশুশ্রেণী শেষ করার পূর্বেই অনেক আদিবাসী শিশু বিদ্যালয় ত্যাগ করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো কোনো জনগোষ্ঠী প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত সীমিতভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের চেষ্টা করছে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কীভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে-লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটা টাস্কফোর্স কাজ করছে।

সারা পৃথিবীতে মাতৃভাষার যেমন কদর বেড়েছে, তার সঙ্গে জাতিবৈরিতার পাশাপাশি ভাষাবৈরিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে হিন্দিকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা সম্ভব হয়নি। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গে আদালতে বাংলা ভাষার প্রস্তাবিত ব্যবহার অনুমোদন করেনি। শ্রীলঙ্কায় সিংহলি-তামিল ভাষাভাষীদের দ্বন্দ্ব জাতিগত দ্বন্দ্বকে আরো জটিল করে তুলেছে। এক ভাষা আইনের জোরে চাপিয়ে দিতে গিয়ে বহু সরকার নাজেহাল হয়েছে।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের ফলে একসঙ্গে একাধিক ভাষার প্রচার ও সমান্তরাল অনুবাদ সম্ভব হলেও একটি ভাষার পরিবর্তে একাধিক ভাষা ব্যবহারে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। সারা বিশ্বে ভাষাবৈরিতা বৃদ্ধি পেলেও মানুষের মানবাধিকার ও তার ব্যক্তি-অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে তার মাতৃভাষার ব্যবহারের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে মানবসত্তার মর্যাদার প্রতি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধাবোধের জন্য।

একটি ভাষার মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। যখন কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় বা নিরুৎসাহিত করা হয় তখন ভাষার মর্যাদা হ্রাস পায়। আবার যে-ভাষা এতদিন সরকারি কর্মকাণ্ডে অব্যবহৃত ছিল, তার ব্যবহার যখন অনুমোদন লাভ করে তখন সে-ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

বহুভাষী রাষ্ট্রে একটি বিশেষ ভাষা অবলম্বন, পালন, প্রচার বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা বা একটি জনগোষ্ঠীকে একটি ভাষা শিখতে বাধ্য করা বা একটি বিশেষ ভাষা শিখতে নিরুৎসাহিত করার কাজ বড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। সংখ্যালঘিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীর আত্মসম্মান তাতে আহত হতে পারে। কঠিন জনজাতিগত বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিরোধ-নিরসনের জন্য আদিবাসী-উপজাতিদের মধ্যে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও মজার মজার পদ্ধতির চল রয়েছে। ভাষাবৈরিতার কোনো অবকাশ নেই কলম্বিয়া ও ব্রাজিল সীমান্তে উত্তর আমাজনের টুকানো সম্প্রদায়ের মাঝে। টুকানোদের সংস্কারে, বর ও কনের দুজনের মাতৃভাষা অভিন্ন হলে তাদের মধ্যে বিয়ে অচল। বর ও কনের মাতৃভাষা অভিন্ন হলে তো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হলো! টুকানো সমাজে ছেলেমেয়েরা দ্বিভাষী, বহুভাষীও। এক গ্রামের লোকে অন্য গ্রামে গেলে নিজের ভাষায় কথা বলার লোকের অভাব হয় না।

একই ভাষার মধ্যেও ধর্মের কারণে অসূয়া বা মতপার্থক্য দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি একটা দোটানা ভাব ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। ১৯৩৭ সালে সিলেটে মুসলিম সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে মৌলভী দেওয়ান মোহাম্মদ আহরাব চৌধুরী বি. এ. বিদ্যাবিনোদ বলেন, "আমাদের মুসলিমসমাজে মাতৃভাষা লইয়া কোন বিরোধ নাই। এমন নির্বোধ কে আছে যে বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিবে না, কিন্তু আসল বিরোধই বাঙ্গালার কালচারের ভাষা

লইয়া। বাঙ্গালা ভাষা নিশ্চয়ই আমাদের মাতৃভাষা, কিন্তু বর্তমান স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক ও কাব্য উপন্যাসের বিদ্যাসাগরী রাবীন্দ্রিক বাঙ্গালাকে আমরা কখনও নিজের মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যে-ভাষায় আল্লাহ, রসুল, নামাজ, রোজার নাম গন্ধ নাই, যে-ভাষায় তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত হইলেও পাঠক মুসলিমের প্রাণ স্পর্শ করিবে না সে-ভাষা কখনও আমাদের মাতৃভাষা হইতে পারে না। ইহাকে আমাদের বিমাতৃভাষা বলা যাইতে পারে। আমি আধুনিক বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালাকে আমাদের বিমাতৃভাষা বলিয়া থাকি। বিমাতা যেমন সৎপুত্রের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের ভাষা কর্তৃপক্ষও ঠিক সেই রূপ আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবহার করিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পরীক্ষক বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় 'কখনো বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইবে না' বলিয়া আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের অপরাধে প্রবাসী যদি ইহাকে মক্তবের ভাষা ও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'মুসলিম বাংলা' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারিলেন, তবে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় বলিয়া আমরাও কেন টোলের বাংলা, হিন্দুয়ানী বাংলা, পণ্ডিতী বাংলা, ভট্টাচার্য্যের বাংলা, শূদ্রের বাংলা প্রভৃতি হরেক রঙ্গের বাঙ্গালা বলিতে পারিব না? আরবী ফারসী শব্দকে রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যদি 'যবণাধিকারের চিহ্ন' বলিতে পারিলেন, তবে সংস্কৃত শব্দকে 'কাফির অধিকারের চিহ্ন' বলিলে সেন মহাশয়ের কাছে কেমন লাগিবে? তারপর মধ্যপ্রদেশের ডাঃ মুঞ্জের ভাষার অনুকরণ করিয়া বাঙ্গলার কবি রবীন্দ্রনাথের মুসলিম বঙ্গকে ধমক দিয়া বলিলেন—'আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্ট রূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়, তবে তারা বাংলা ত্যাগ করিয়া উর্দু গ্রহণ করিতে পারেন।' এই কথায় ডাঃ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত হিন্দু মানসিকতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতার বিমানে চড়িয়া যখন আকাশে ভ্রমণ করিতেন, তখন তিনি সকল দেশের সকল সমাজের। কিন্তু যখন তিনি এই সাম্প্রদায়িকতার ধুলাবালিপূর্ণ পৃথিবীতে আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেন, তখন তিনি আর বিশ্বপ্রেমিক রহিলেন না; হইয়া গেলেন হিন্দুপ্রেমিক ও হিন্দু কবি। তিনি বোধ হয়—এখনও ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু যুগে ডুবিয়া আছেন। আমরা তাহাকে জানাইয়া বলিতেছি, আজ বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গলা সাহিত্য মুসলিমের। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী বলিতে তুর্কী ও আফগানের ন্যায় মুসলিমকেই বুঝাইয়া থাকে। তিনি যদি মুসলিমের আরবী ফারসী শব্দের প্রচলন বরদাস্ত করিতে না পারেন তবে নিজেই বাংলা সাহিত্য ত্যাগ করিয়া বিশ্বভারতী আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন।"

সেই ভাষণে মি. শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যিনি বলেছিলেন, 'With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic, the days of her defeat, humiliation and bondage. The budding patriotism of Hindus everywhere would therefore natuarlly eschew Persian and Arabic words as bondage of slavery.'

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাও উল্লেখ করা হয়। তিনি বলেছিলেন—'সাত শত বছরের মুসলমানদের সহিত বাস করিয়া বাংলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সেসব জিনিস বাংলার হাড়েমাংসে জড়িত রহিয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া কিছুতেই সফল হইবে না। যাহারা বাংলাকে শুদ্ধ বা মার্জিত করিতে চান তাহাদের সে চেষ্টা কখনও সফল হইবে না।'

মৌলভী আহরাব চৌধুরী কতকগুলো আরবি শব্দের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ঈশ্বর, ভগবান, পূজা, তর্পণ, অবতার, জন্মান্তর প্রভৃতি শব্দের ভিত্তির উপর হিন্দু ধর্ম ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত। এই সকল পৌত্তলিকতাপূর্ণ ও শির্‌ক-ভাবাপন্ন শব্দ মুসলিম সাহিত্যে কখনও প্রচলিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ, রাসুল, নমাজ-রোজা, হজ্ব, জাকাতের কোন প্রতিশব্দ দুনিয়ার আর কোন ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আল্লাহর প্রতিশব্দ বা অনুবাদ ঈশ্বর ও God দ্বারা হইতে পারে না। আল্লাহ এক, তাঁহার কোন শরিক নাই, তাঁহাকে কেহ জন্ম দেয় নাই, ও তিনি হইতেও কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর ও God-এর আবার স্ত্রীলিঙ্গ ও বহুবচন আছে, যথা—ঈশ্বরী, God Goddess, ঈশ্বরের আবার ছোট বড় আছে—যথা, পরমেশ্বর, মহেশ্বর প্রভৃতি। কিন্তু আল্লাহ শব্দের এইরূপ কোন দোষ ত্রুটি নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। রসুল, হজ্ব, জাকাত ও মসজিদের অনুবাদ ভাববাদী তীর্থযাত্রা, দান ও মন্দির দ্বারা হইতে পারে না। রোজার বদলে উপবাস হইতে পারে না। কারণ উভয়ের সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রোজার নিয়ত করা ফরজ; এবং ছোবহে সাদেক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কেহ খানাপিনা করিতে পারে না। কিন্তু একজন নিয়ত না করিয়া সমস্ত দিন উপবাস করিলেও রোজা হইবে না। একাদশীর উপবাসের নামও উপবাস, দুর্ভিক্ষের সময় ভাত না খাইয়া যে উপবাস তাহাও উপবাস। সুতরাং রোজা ও উপবাস এক হইতে পারে না। এই সকল শব্দের অনুবাদ কোন প্রকারে গুজামিল দিয়া চালাইলেও ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, নফল, আজান ও একামতের প্রতিশব্দ বাহির করা অসম্ভব।'

মৌলভী আহরাব চৌধুরী আরো বলেন, 'কোরআন শরীফের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক জনাব মৌলবী আব্বাছ আলী ছাহেব হাম্‌দ-এর অনুবাদ প্রশংসা, ও না'বুদুর অর্থ পূজা করিতেছি লিখিয়াছেন। এখানে আরবী হাম্‌দ-এর অনুবাদ প্রশংসা দ্বারা হইতে পারে না। আরবী হাম্‌দ বাঙ্গলায়ও হাম্‌দ রাখিতে হইবে। কারণ বাঙ্গালায় এক প্রশংসা ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। কিন্তু আরবীতে প্রশংসারও শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা-হাম্‌দ, নাত ও মাদাহ প্রভৃতি। আল্লাহ তালার জন্য যে প্রশংসা করা হয়, তাহা হইল হাম্‌দ, হযরত রাসুলে করিমের (দঃ)

জন্য যে প্রশংসা করা হয় তাহা হইল নাত; বাদশাহ ও উমারাগণের জন্য যে প্রশংসা তাহা হইল মাদাহ। হামদের আভিধানিক অর্থ প্রশংসা হইলেও ইসলামী সাহিত্যে ইহা একমাত্র আল্লাহতালার প্রশংসা অর্থে ব্যবহৃত হয়। না'বুদুর অনুবাদ, পূজা করিতেছি হইতে পারে না। কারণ পূজা শব্দের সহিত পৌত্তলিকতার ভাব সংশ্লিষ্ট আছে।'

১৯৬৪ সালের ১১ ও ১২ জানুয়ারি ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় বাংলা একাডেমীতে মাইকেলের জন্মবার্ষিকীতে *কৃষ্ণকুমারী* মঞ্চস্থ হয়। সেই নাটকে কৃষ্ণা তাঁর মাকে একটা গোলাপ উপহার দেন। উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহ তাঁর কন্যাকে গোলাপ সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেন। তার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পাঠ্যক্রম থেকে নাটকটি যাতে প্রত্যাহার করা হয় তার ব্যবস্থা নেন। গোলাপ সম্পর্কে মন্তব্যটি ছিল এইরূপ, 'রাজা। পূর্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্ছে। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুসুমরত্ন দুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে! (দূরে দুন্দুভিধ্বনি)।'

কবি ভারতচন্দ্র অবশ্য গলবস্ত্র হয়ে যাবনী মিশাল শব্দ ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষা শুদ্ধ করার জন্য পূর্বে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রয়াস পেলেও সে-শুদ্ধি আন্দোলনের জেদাজেদি এখন আর নেই। তবে মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশে আরবি ফারসি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে কাফন বা কাবিনের মানে করে দিতে হয়। একই ভাষা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যেও যে-পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যেও অসূয়া থেকে যায়।

আবার একই ভাষায় অনুবাদকর্মে পার্থক্য বা তারতম্য হয়ে যেতে পারে। বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধানে এবং বাংলায় অনূদিত ভারতের সংবিধানে একই ইংরেজি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদ। ইংরেজি বিল, ক্লজ, জুরিসডিকশন, ইম্পিচমেন্ট, রিপাবলিক ও স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ-এর আমরা বাংলা করেছি বিল, দফা, এখতিয়ার, অভিশংসন, প্রজাতন্ত্র ও রাষ্ট্রভাষা। ভারতে উক্ত ইংরেজি শব্দের অনুবাদ যথাক্রমে বিধেয়ক, প্রকরণ, ক্ষেত্রাধিকার, মহাভিযোগ, সাধারণতন্ত্র ও সরকারি ভাষা। অনেকে বলেন, দুটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য দ্বিখণ্ডিত এক ভাষা ইংরেজি দ্বারা।

চাষাভুষো-ভদ্রলোক-ফারাক-এক ভাষাতেও থাকে। ইংল্যান্ডে ইউ ও নন-ইউ-এর একটা উন্নাসিক শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে। ভাষাবিদ ড. ডেভিড ড্যালবি একবার উঁচুমহলে 'ল্যাভেটরি' না বলে 'টয়লেট' বলে জীবনের এক বড় বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন। যেসব দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ ছিল সেখানে উঁচুমহলে সাবেক প্রভুদের ভাষার কদর বেশি, মোহ কাটে না। আমাদের দেশে অনেকে ইংরেজি ভাষায় বিয়ের দাওয়াত পাঠান। বর-কনের বিয়ে হয়তো ইংরেজি ভাষার

বদৌলতে শুভ হয়। ইদানীং দেশে বেসরকারি বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বিপণি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ইংরেজিতে রাখা হচ্ছে। সাবেক উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা পেয়েও এখনও হীনম্মন্যতায় ভোগে।

দেশে এমনও কথা শোনা যায় যে স্বাধীনতা-পরবর্তী আমলে অনন্যোপায় হয়ে আমরা যে শিল্পের জাতীয়করণ করেছিলাম তাতে আমাদের যে লেজেগোবরে অবস্থা হয় অনুরূপ অবস্থা নাকি হয়েছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পূর্ব মর্যাদাদানের প্রচেষ্টায়। আজ বাংলা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। বাংলা ভাষার পক্ষে না বললে ভোট হারানোর কোনো ভয় নেই বরং ভুলভাল ইংরেজি বললে বাহবা ও ভোট দুটোই পাওয়া যেতে পারে।

সাধারণভাবে মানুষের মাতৃভাষার প্রতি যে আবেগময় প্রেম থাকে বাংলাভাষীদের মধ্যে তার মাত্রা হয়তোবা একটু বেশি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে আমরা অবশ্য অত আত্মকেন্দ্রিক ছিলাম না। আমরা নিছক বাঙালিয়ানা দিয়ে শুরু করিনি। আমরা বিদ্বেষমূলক বা আগ্রাসী অবস্থান নিইনি। আমরা চেয়েছিলাম বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হোক এবং পাকিস্তানে সকল ভাষার প্রতি যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হোক। 'একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয়'—আমাদের এই কথাটা বিশ্বের লোক শুনেছে। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার থেকে সাম্প্রতিক একাধিক ঘোষণায় সকলের, বিশেষ করে আদিবাসী বা সংখ্যালঘুদের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এখন সকলে আইনের সমক্ষে আশ্রয় পেলে হয়। আজ আমরা সকল ভাষার প্রতি ভালোবেসে 'হ্যাঁ' বলব এবং সব ধরনের ভাষাবৈরিতাকে 'না' বলব।

প্রথম আলো ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

বিপন্ন ভাষা

রূপকথার দুই গ্রিম-ভাইয়ের এক ভাই—ইয়াকুব গ্রিম—আধুনিক তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁর মতে, জাতি হচ্ছে জনগণের সেই সমগ্রত্ব যা একই ভাষায় কথা বলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাতির সংজ্ঞানিরূপণে উত্তরোত্তর ভাষার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। ভাষার ওপর ভিত্তি করে সম্মিলিত ইতালি ও সম্মিলিত জার্মানির জন্ম। নরওয়ে ১৯০৫ সালে সুইডেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির মতে, ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা ঐতিহ্যগত সীমান্ত বা নতুন ভৌগোলিক অধিষঙ্গের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে একান্তভাবে মাতৃভাষার প্রতি আসক্ত হয়। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া ও পোলান্ডের মানচিত্র-নির্ণয়ে ভাষার বেশ প্রভাব থাকে। আবার ভাষার কারণে পূর্ব ইউরোপে পুরোনো রাষ্ট্র ভেঙে নতুন নতুন রাষ্ট্র হয়েছে।

মানুষের অস্তিত্ব, তার সত্তার বিকাশ ও মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে আজ ভাষার অধিকারের কথা উঠেছে। নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে সমাজের মধ্যে এক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে ভাষার সাহায্যে মানুষ সমাজ গঠন করেছে। ভাষার সাহায্যেই তার চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা, বিশ্বের গতিবিধি ও পরিবেশ নিরীক্ষণ এবং কর্মকাণ্ডে এক শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা।

প্রকাশভঙ্গি ও প্রকাশের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক এতই গভীর যে, মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা বিপন্ন বা বিনষ্ট হয়, যদি তাকে তার ইচ্ছামতো ভাষাব্যবহার করতে দেওয়া না হয়। ভাষাই প্রকাশের বিষয় ও বক্তব্যকে রূপ, রস ও রঙে অর্থবহ করে তোলে। ভাষা একজন মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিমানসের পরিচয় এবং একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্বারূপ্যের নিদর্শন।

সারা পৃথিবীতে মাতৃভাষার কদর বাড়লেও জাতিবৈরিতার পাশাপাশি ভাষাবৈরিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভাষাবৈরিতা বৃদ্ধি পেলেও মানুষের

মানবাধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে তার মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রতি সমর্থনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

'জন্মভাষা' বা 'মাতৃভাষা'—দুটো কথাই আলংকারিক। কোনো ভাষাবিশেষের জ্ঞান কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় না, তাকে তা অর্জন করতে হয়। কোনো ভাষার প্রতি পূর্বপ্রবণতা বা পূর্বাসক্তি নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। ভাষাবিদ নোম চোমস্কি বলেন, শৈশবে ছেলেমেয়েরা কোনো তালিম না পেয়েই তাদের জন্মের ভাষা শেখে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে সেই ভাষায় কর্তৃত্ব অর্জন করে। আবার ভাষার মতো জটিল জিনিস প্রাকৃতিক জগতে আর কিছু নেই। একটা ভাষা গাণিতিক দিক থেকে পাটীগণিতের চেয়েও জটিল। ভাষাবিদদের মতে, ভাষা মানুষের একটা অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তি যার জন্যে তার মস্তিষ্কে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ পদ্ধতি কাজ করে। অনেকে বলেন, সেই বিশেষ ব্যবস্থাটি বারো বছর বয়সের পর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। আবার অনেকে বলেন, ওই বয়সেই তো ভাষার প্রতি মানুষের কৌতূহল জন্মায়।

সারা পৃথিবীতে মোট ভাষার সংখ্যা নিয়ে নানা মত। কেউ বলেন ১০ হাজার, কেউ বলেন সাড়ে ৬ হাজার। ভাষার সঙ্গে উপভাষা বা ভাষার সঙ্গে অপভ্রংশ সমভাবে বিবেচিত হবে কি না, এ নিয়ে মোট সংখ্যার হেরফের। এক-চতুর্থাংশ ভাষার ও কিছু উপভাষার বর্ণমালা রয়েছে। তা ছাড়া আরো ভাষা থাকতে পারে ভাষাবিদরা এখনো যার হদিস পাননি। 'এথনোলোগ : ল্যাংগুয়েজেস অব দা ওয়ার্ল্ড'র ডেটাবেসে কিছুদিন আগে তালিকাভুক্ত ভাষার সংখ্যা ছিল ৬৮০৯। কমবেশি দশ লাখ লোক ৩০০ ভাষায় কথা বলে। মোট ভাষার প্রায় অর্ধেক ভাষায় কমবেশি ৬০০০ লোক কথা বলে। সাড়ে চারশ ভাষায় এতো কম লোক কথা বলে যে তাদের বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মোট ভাষার ২৮% প্রায় দুই হাজার এশিয়ায়, ১৫% প্রায় এক হাজার দুই আমেরিকায়, ৩৫% প্রায় ২৪০০ আফ্রিকায়, ৩% প্রায় দুশো ইউরোপে এবং ১৯% প্রায় ১২০০ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় চালু রয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব, ব্যবসা-বিনিময়ের সুবিধা, সাহিত্যিক গুণ বা গবেষণার প্রয়োজনের ওপর ভাষার ব্যবহার নির্ভর করে। পৃথিবীর ৬০ ভাগ ভাষা ১০ হাজারের বেশি লোক ব্যবহার করে না এবং ১০০ জনেরও কম ১০ ভাগ ভাষা ব্যবহার করে। বিশ্বায়নের ফলে বৈশ্যপ্রভাবে ভাষার সংখ্যা হ্রাস পাবে, তবে বহুভাষিতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। ইংরেজি ভাষার সূতিকাগৃহ রাজধানী লন্ডন শহরে ছেলেমেয়েরা আজ ৩০৭টি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে।

নিজের ভাষার আধিপত্য রক্ষাকল্পে কর্তৃত্ববাদীরা প্রায়শ আস্ফালন করে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়বিংশতিতম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট বলেছিলেন, 'এখানে আমাদের কেবল একটি ভাষার স্থান রয়েছে এবং তা হচ্ছে ইংরেজি, কারণ আমরা চাই মৃষা থেকে আমাদের জনগণ বহুভাষী বোর্ডিংহাউসের বাসিন্দাদের মতো নয়, বরং আমেরিকান জাতীয়তার ভেতর থেকে আমেরিকান

হয়ে বেরিয়ে আসবে।' তিনি আরো বলেন, 'আমাদের একটিই পতাকা থাকতে হবে। আমাদের ভাষাও একটি থাকতে হবে। সেই ভাষা হবে স্বাধীনতার ঘোষণার ভাষা, ওয়াশিংটনের বিদায়ী ভাষণের ভাষা, লিনকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতার ভাষা এবং তাঁর উদ্বোধনীর ভাষা।'

প্রায় অনুরূপ বক্তব্যে বিশ্বাস করে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেছিলেন, 'পাকিস্তানে উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ যখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ব্যবহারের জন্য পাকিস্তান গণপরিষদের সংসদ-বিধির এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান মন্তব্য করেন, 'মাননীয় সদস্য প্রস্তাবটি পেশ না করলেই ভালো করতেন। মাননীয় সদস্যের বোঝা উচিত, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্র যে-১০ কোটি মুসলমানের জন্য তৈরি হয়েছে তাঁদের ভাষা উর্দু।'

ভাষা-জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন, দেশের প্রধান ভাষা সকলের শেখা উচিত, ঘরে সে যে-ভাষাতেই কথা বলুক-না কেন। অনেকে মনে করেন, ভাষা-গবেষণার বিকৃতরূপ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায় এবং বিদেশী পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে অসাবধানে স্থানীয় ভাষাকে বিকৃত করে ফেলছেন।

দেশী ভাষার পুনরুদ্ধার বা সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। ইন্দোনেশিয়ায় বাহাসা ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া নিউগিনিতে নিওমেলানেশিয়া, ইসরায়েলে হিব্রু, ফিলিপাইনে তাগালোগ এবং পেরুতে কেচুয়া ভাষার নবায়ন ঘটছে। আবার বিদেশী ভাষা যেমন ইংরেজি ভারত, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও পাপুয়া নিউগিনিতে সরকারি কাজকর্মে, শিক্ষায় বা ভাষায় আত্তীকৃত হয়েছে।

পৃথিবীর যে-কোনো দেশে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভাষার অধিকারের দাবি সর্বপ্রথমে উচ্চারিত হয়। যখন কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ বা নিরুৎসাহিত করা হয় তখন সেই ভাষার মর্যাদা হ্রাস পায়। আবার সরকারি কর্মকাণ্ডে অব্যবহৃত ভাষার ব্যবহার যখন অনুমোদন লাভ করে তখন সে-ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। একটি বিশেষ ভাষাকে লালন করার জন্য এবং অনেক সময় অন্য ভাষার ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকারের ভাষা-পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দেয়। যে-কোনো দেশে ভাষার ব্যবহারে সামান্য পরিবর্তনও তুলকালাম অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

ভাষার ব্যাপারে ইউনেস্কোর একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগী ভূমিকা রয়েছে। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে সংস্থার মহাপরিচালক ফ্রেডেরিকে মাইওর জারাগোজা (Frederico Mayor Zaragoza) পৃথিবীর ভাষার মানচিত্র প্রণয়নের জন্য এক প্রস্তাব দেন। দুনিয়ার ভাষার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ইউনেস্কোর লিঙ্গুয়াপ্যাক্স নামে একটা প্রজেক্ট রয়েছে। বিভিন্ন দেশের ভাষা-গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে ইউনেস্কো সংযোগ

রক্ষা করছে। এদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো লিঙ্গুয়াস্ফেয়ার অবজারভেটরি।

ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্টিফেন এ উওরম (Stephen A. Wurm) কর্তৃক সম্পাদিত অ্যাটলাস অব দ্য ওয়ার্ল্ড'স ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন ডেনজার অব ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সে (বিপন্ন ভাষার মানচিত্র) বলা হয়েছে, বিভিন্ন কারণে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাষার এক দারুণ দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয়। ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসী তৎপরতা এবং শুটিবসন্তের মতো মহামারি উত্তর আমেরিকা, সাইবেরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। স্থানীয় অধিবাসীরা ও তাদের ভাষাসমূহ বড় বিপদের সম্মুখীন হয়।

পৃথিবীর মোট ভাষার প্রায় অর্ধেকসংখ্যক ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। ক্রোনো কোনো সময়ে খরা, বন্যা, গর্কি, সুনামি, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, গণহত্যাজনিত দুর্ভোগ এবং অন্যান্য দুর্গতির জন্য হঠাৎ একটা ভাষাগোষ্ঠী লোপ পেয়ে যেতে পারে। ব্যাপক দেশত্যাগ বা ভিন্নদেশ থেকে শরণার্থী বা অভিবাসীদের আগমনেও ভাষার বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পেতে পারে।

ভাষার জাদুঘরে বিপন্ন ভাষার স্মৃতি নিদর্শন রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগী ভাষাবিদ কাজ করছেন। ফ্রান্সের নরম্যান্ডি, কানাডার কুইবেক এবং ইংল্যান্ডের ওয়েলসের ভাষাপ্রেমীদের উদ্যোগে লিঙ্গুয়াস্ফেয়ার অবজারভেটরি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেনেগালের প্রেসিডেন্ট কবি লেওপোল্ড সেদার সেঙ্ঘর এবং প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ভাষাবিদ ড. ডেভিড ড্যালবি। লিঙ্গুয়াস্ফেয়ার রেজিস্ট্রার সারা বিশ্বের ভাষা ও উপভাষার শ্রেণীবিভাগ ও নির্ঘণ্ট তৈরি করেছে। ভারতে বরোদার ভাষা রিসার্চ সেন্টার এবং পুনার সেন্টার ফর কমিউনিকেশন উক্ত লিঙ্গুয়াস্ফেয়ার অবজারভেটরির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে কাজ করছে।

এখনো ইন্দোনেশিয়ায় সংগীত, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাঁচশোরও বেশি লোকে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করছে। বাহাসা ইন্দোনেশিয়ার প্রসার এবং ইদানীংকালে ইংরেজির প্রতাপে বেশির ভাগ আঞ্চলিক ভাষা আজ বিপন্ন।

গত পাঁচশো বছরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সহস্রাধিক আমেরিন্ডিয়ান ভাষা এবং গত দুশো বছরে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বহু ভাষা হারিয়ে গেছে। এখন কোনো কোনো আমেরিন্ডিয়ান ভাষা মাত্র পাঁচ বা দশজন লোক ব্যবহার করে।

ইউরোপীয় উপনিবেশের পূর্বে অস্ট্রেলিয়ায় শত শত আঞ্চলিক ভাষাসহ ২৫০টির ওপর প্রধান ভাষা ছিল। এখন মাত্র ১৭টি আদিবাসী ভাষা বেঁচে আছে অর্থাৎ সকল বয়সের আদিবাসীরা ওই ভাষাগুলো ব্যবহার করে থাকে। পঞ্চাশ হাজার আদিবাসীর বেশির ভাগই বাস করে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থায়। কিমবারলি ল্যাংগুয়েজ রিসোর্স সেন্টারের প্রধান কর্মকর্তা

জুন অস্কার বলেন, 'আপনি নিজের অনুভূতি যেভাবে নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন সেভাবে ইংরেজিতে প্রকাশ করতে পারবেন না। আপনি অনুভব করতে এবং বুঝতে পারছেন কী বলা হচ্ছে, কিন্তু ঠিক তা মাথায় ঢুকছে না। যখন দেশে আমরা নিজেদের ভাষা বলি তখন আমাদের মনে হয় সেই দেশ সেই সময়ের শুরু থেকে আমাদের কথা শুনে আসছে এবং আমরা তখন এমন ভাবতে চেষ্টা করি যেন সময়ের গোড়ায় আমরা ফিরে গেছি এবং এই দেশটা যেন সেই একটিমাত্র ভাষাই জানে। ... যখন আমরা দেশে যাই এবং লোকে দেশের কথা বলে, তখন মনে হয় আমরা কেবল দেশের সঙ্গে কথা বলছি না বরং এই দেশের যেসব মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, তাঁদের আত্মাও যেন ফিরে এসেছে এবং আমরা যেন তাঁদেরও সঙ্গে কথা বলছি।'

সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় বারোটি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে এখন যে-অবস্থা তাতে অনেক ভাষা এমনভাবে মারা যাবে যে তাদের কোনো চিহ্ন থাকবে না এই ধরাধামে। আফ্রিকায় দেড়-দু'হাজার ভাষা এবং প্রশান্ত মহাসাগর উপকূল অঞ্চলের প্রায় অনুরূপ সংখ্যার ভাষার মধ্যে বহু ভাষারই অচিরেই মৃত্যু ঘটবে।

ব্রিটেনের দুটো কেল্টিক ভাষা ম্যাংক্স ও কর্নিশ হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ম্যাংক্সের মৃত্যু ঘটে। আর কর্নিশ ভাষার নাকি মৃত্যু হয় ১৭৭৭ সালে যখন কর্নিশভাষী শেষ ব্যক্তিটি ইহলোক ত্যাগ করেন। চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জের জার্সি, গের্নসি ও সার্কের ফরাসি উপভাষার দিন ঘনিয়ে আসছে। স্কটিশ গেইলিক (Scottish Gaelic) ভাষায় এখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক কথা বলে। বাইবেল ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো বই গেইলিকে লেখা হয় না এবং ও-ভাষা বাঁচিয়ে রাখার জন্য তেমন উৎসাহও নেই।

একটি ভাষা মরে গেলেও অর্থাৎ সেই ভাষায় কেউ কথা না-বললেও কোনো কোনো ভাষার ক্ষেত্রে তার প্রভাব থেকে যায়। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাচর্চায় ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিক ও লাতিন, উত্তরভারতের বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত, জাপানি, কোরিয়া ও বর্তমান চৈনিক ভাষার সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল চীন ভাষার কথা আসে। পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের যেমন সম্পর্ক থাকে মধ্যপ্রাচ্যে ও উত্তর আফ্রিকায় প্রচলিত আরবির সঙ্গে ক্ল্যাসিক্যাল আরবির তেমনি একটা সম্পর্ক রয়েছে।

ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের রাজধানী ভ্যাটিক্যানের সরকারি ভাষা লাতিন। ক্যাথলিক গির্জার উপাসনায় তার ব্যবহার তেমন আর হচ্ছে না। অক্সফোর্ডে যেসব বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে লাতিন শেখা আবশ্যকীয় ছিল সেখানে লাতিন বাদ দেওয়ার কথা উঠেছে। আবার লাতিনকে আধুনিকীকরণের এক মজার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ আট বছর ধরে কাজ করার পর ভ্যাটিক্যানের বেশ কয়েকজন পণ্ডিতের যৌথ প্রচেষ্টায় লাতিনের একটা সর্বাধুনিক অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। মনসিনইয়র কার্লো এগের অভিধানটি সম্পাদনা করেন। আজকালকার

এরোসল, স্প্রে, মোটরবাইক, ট্যাক্সি, এয়ারপোর্ট, হর্ন, ট্রাফিক জ্যাম, মোবাইল ফোন, ডিপার্টমেন্ট স্টোর, জ্যাকেট, শার্ট, ট্রাউজার, জুতো, মোজা, আন্ডারওয়্যার, হ্যামবার্গার, স্ট্রিপার ইত্যাদি নানান শব্দের লাতিন রূপ রয়েছে অভিধানে।

যে-ভাষা মুমূর্ষ তাকে মরে যেতে দেওয়াই ভালো—এমন ভেবে পিতামাতা সন্তান-সন্ততিদের মুমূর্ষু ভাষা শিক্ষা দিতে চায় না। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষার মর্যাদা কম সেখানে সেই ভাষা লোকে পরিহার করার চেষ্টা করে। আলাস্কায় বিশ বছর আগে Yupik-সমাজের সবাই Yupik ব্যবহার করত। এখন কমে গেছে।

একবিংশ শতাব্দীর শেষে কোনোরকমে তিনশো ভাষা টেনেটুনে বেঁচে থাকতে পারে। ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও চৈনিক ভাষার রথের তলায় নিষ্পেষিত হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বহু ভাষা। এ-ব্যাপারে কোনো দেশ বা কোনো ভাষাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ভাষার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই। সকল ভাষার মধ্যেই যাতায়াত ঘটে।

ভাষার বিলুপ্তির ব্যাপারে দুটো পরস্পরবিরোধী মত রয়েছে। একটি মতের ভাব, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?' আর তা ছাড়া বিভিন্ন ভাষার মধ্যে পার্থক্য এমন নয় যে, একটি ভাষার বিলুপ্তি ঘটলে মানবসমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অন্যদের মত হচ্ছে, প্রত্যেক ভাষার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, বাকভঙ্গিমা এবং বিশ্ব-ধারণা রয়েছে। ভাষার মধ্যে উন্নত বা অনুন্নত ভাষা বলে কিছু নেই। একটি ভাষার নৈপুণ্য বা গুণ বিচারের জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো মাপকাঠি নেই। প্রত্যেকটি ভাষা অমূল্য, বিদগ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সংস্কৃতির স্বারূপ্যের চেয়েও বেশি। ভাষা একটা সমাজধারা, আত্মবিশ্বাস এবং এক বিশেষ ধরনের দর্শনের মেরুদণ্ডবিশেষ। এ শুধু প্রাচীনকালের পুরাস্মৃতি নয়, এ ভবিষ্যতের এক দিকনির্দেশনাও বটে। গত চার দশকে এই মতের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দলিলে তা প্রতিফলিত হয়েছে। গত পনেরো বছরে বিলুপ্ত ভাষার ওপর কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, মেক্সিকো, সুইডেন, স্পেন ও হংকংয়ে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে।

ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর বিশ্বের সমস্ত ভাষার উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং বিশ্ব ভাষার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব ইরিয়ান-জায়ার একজন অস্ট্রেলিয়ান পণ্ডিত এক হাজার লোকের ইয়াই (Yei) ভাষা, তিনশো বিশজনের কানুম ভাষা এবং পঞ্চাশজনের মোরাওরি (Moraori) ভাষার ব্যাকরণ তৈরির কাজ করছেন। Endangered Languages Foundation (ELF)-এর মতো প্রতিষ্ঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসে এ-ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে।

এডওয়ার্ডসভিলের দক্ষিণ ইলিনোয়া ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রনশেফের (Ronschaefer) দু'হাজার বছরের পুরনো উসধর ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। দক্ষিণ-মধ্য নাইজেরিয়ার এক গহিন অঞ্চলে স্থানীয় ভাষা ইয়োরুবা, ইগবো ও বিনির দূরাত্মীয় ওই ভাষায় প্রায় ত্রিশ হাজার লোক এখনো কথা বলে। সেই ভাষার লিপি, ব্যাকরণ বা অভিধান ছিল না। গ্রামপ্রধান, বয়েতি বা কথকদের কাছ থেকে ওই ভাষাবিদ সংগ্রহ করেন সত্তরাধিক লোককাহিনী এবং তা টেপরেকর্ড করেন। একটা লিখনপদ্ধতিও দাঁড় করান। যে-ত্রিশ হাজার লোক উসধর ভাষায় এখনো কথা বলে আগামী পঞ্চাশ বছর পর তাঁরা বেঁচে না থাকলে তাঁদের ভাষার মৃত্যু ঘটবে।

১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের চুক্তির ২৭ ধারায় বলা হয়েছে : 'যদি কোনো দেশে আঞ্চলিক, ভাষাভিত্তিক বা ধর্মীয় এমন জনগোষ্ঠী থাকে যারা ওই দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ তবে তাদের ক্ষেত্রে এই অধিকার অস্বীকার করা যাবে না; সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে তাদেরকে নিজস্ব সংস্কৃতি উপভোগ, নিজস্ব ধর্ম অবলম্বন ও প্রচার এবং নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা যাবে না।'

১৯৯২ সালের জাতীয়তা বা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের অধিকারের ঘোষণায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করবে, তাদের স্বারূপ্যের উন্নয়নের জন্য তৎপর হবে এবং তার জন্য যথোপযুক্ত আইনপ্রণয়ন বা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯৯৫ সালের আদিবাসীদের অধিকারসমূহের খসড়া ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধিতে বিভিন্ন জাতি যে-অবদান রাখে তা মানবজাতির এক যৌথ উত্তরাধিকার।

৬-৯ জুন ১৯৯৬ বার্সিলোনা সম্মেলনে ভাষা অধিকারের একটি সর্বজনীন ঘোষণায় কয়েকটি রাষ্ট্র অনুস্বাক্ষর করে।

২০০১ সালের ইউনেস্কো জেনারেল কনফারেন্সের ৩১তম অধিবেশনে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর একটি সার্বজনীন ঘোষণা গৃহীত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৫৬/২৬২ নম্বর প্রস্তাবটি পাশ করে ভরসা দেয় যে জাতিসংঘ রক্ষণ ও সংরক্ষণের উপায় হিসেবে বহুভাষিতা অনুসরণ করবে।

ওই ঘোষণায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং যাঁরা ভাষা নিয়ে কাজ করছেন তাঁদেরকে নিয়ে ভাষার অধিকারের ওপর একটি বিশ্ব কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১০-১২ মার্চ ২০০৩ বিপন্ন ভাষা রক্ষাকল্পে ইউনেস্কো তার ভূমিকা-নির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের একটি সভার আয়োজন করে। সেই সভায় কর্মপন্থা নির্ধারণকল্পে ইউনেস্কোর জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়।

দলিলে ভাষার নিবন্ধীকরণ ছাড়াও ভাষাবিজ্ঞানীদের একটা বড় কাজ হলো একটি ভাষা যাতে মরে না যায় তার জন্য আত্মরক্ষামূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কোনো কোনো ভাষার পুনরুজ্জীবন ঘটছে। পাঁচ লাখ লোকের ওয়েলস ভাষা এখন বেশ শক্তি অর্জন করেছে।

আন্তর্জাতিক জাইঅ্যানিজম ও ইসরেইলের বদৌলতে হিব্রু ভাষার প্রচলন বেড়েছে।

কানাডায় আমেরিইন্ডিয়ানদের ভাষা শুসওয়াপ (Shuswap) ও স্কোয়ামিশের (Squamish) ওপর প্রাথমিক বইপত্র লেখা হচ্ছে। স্থানিক ভাষাবিদ এয়ার্ট কুইপার্স (Aert Kuipers) কাজ করছেন এ নিয়ে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজের জর্জ হেউইটের (George Hewitt) অফিসে তেওফিক হাসানের (Tevfik Hasan) ফটো রয়েছে। হাসান সেই শেষ ব্যক্তি যিনি উবায়েখ (Ubykh) ভাষায় কথা বলতে পারতেন। হাসান জর্জিয়ার এক মুসলিম গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ১৮৬৪ সালে ওসমানি সাম্রাজ্যে আশ্রয় নেন। ককেসাস অঞ্চলে প্রায় চল্লিশটি ভাষা-উপভাষার এখন মুমূর্ষু অবস্থা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি রোগে পুরাতন ভাষাগুলো মারা যাচ্ছে।

একটি সমাজের ভাষা শুধু ধ্বনি বা কণ্ঠস্বর নয়, সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা, এক অনন্য সংস্কৃতি এবং আঙুলের ছাপের মতো তা এক অদ্বিতীয় নিদর্শন। একটি ভাষার মৃত্যু হলে একটি সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে, এই ভেবে ভাষাবিদরা বিপন্ন ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা করছেন।

একটি ভাষার মৃত্যু হলে তার সঙ্গে ওই ভাষার ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি ও সংহতিও লোপ পায়। ভাষা হারিয়ে গেলে সেই ভাষার মানুষ স্বকীয়তা, স্বারূপ্য, সমাজচেতনা, ঐতিহ্যগত ধ্যানধারণাও হারায়। লৌকিক নিরাময়-পদ্ধতি হারিয়ে জীবনধারণে উৎসাহ পায় না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ আত্মহত্যাও করতে পারে। ভাষাবিদরা মনে করেন অতিরিক্ত যত্ন ও সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া মেরুঅঞ্চলে, আমাজোনিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকার অনেক ভাষা লিগমি ভাষার মতো হারিয়ে যাবে।

নাইজেরিয়ায় ও ক্যামেরুনের এক সীমান্তবর্তী গ্রামে ড. ডেভিড ড্যালবি ৮৭ বছরের এক বৃদ্ধাকে বিকইয়া ভাষায় নিজের মনে কথা বলতে দেখেন। যে-ভাষা তিনি মা-বাবার কাছে শিখেছিলেন, তা শোনার বা শেখার আর কেউ ছিল না বলে তিনি কাঁদতেন। সীমান্ত-বরাবর আরেক গ্রামে বিওয়ো ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে এবং বাবা আর ছেলে, যাঁরা ওই ভাষায় কথা বলতে পারতেন, তাঁরা এখন নতুন ভাষায় কথা বলছেন। ভাষাদুটো হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন নাও হতে পারে।

পৃথিবীর যত ভাষা বা উপভাষা আছে তার একটা রেজিস্টার এবং পৃথিবীর সমগ্র ভাষার কম্পিউটারকৃত এক মানচিত্র ড. ড্যালবি তৈরি করে গেছেন। তাঁর মতে, একভাষিতা বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে এবং তা নিরক্ষরতার মতোই মন্দ।

তিনি মনে করেন, যেহেতু পৃথিবীর আর সব মানুষ তাঁর ভাষা ইংরেজি শিখেছে সেহেতু তাঁর অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে অন্যদের ভাষা শেখা। তিনি বলেন, 'আমার জাতীয় সংগীত 'Land of My fathers'-এর শেষ পঙ্‌ক্তি হচ্ছে—'May the old language live forever', 'পুরাতন ভাষাটি চিরকাল বেঁচে থাক'। পৃথিবীর সব জীবন্ত ভাষা সংরক্ষণের প্রতি যাঁরা যত্নবান তাঁদের জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোনো motto বা আদর্শবাণী আমরা জানি না।'

একটি ভাষা একটি সংস্কৃতির বাহক। সেই সংস্কৃতির মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন তার ভাষা হারিয়ে যায়। অনন্য অনুভব ও ঘটনার সমাবেশে যে-সংস্কৃতির জন্ম তা তার ভাষা হারালে অনেক সময়ে তার স্বারূপ্য বিনষ্ট না হলেও তার জন্য বড় ধরনের একটি সংকট সৃষ্টি হয়।

সাধারণত মানুষ তার ধর্ম ও ভাষার সঙ্গে নিজের স্বরূপতা নির্ণয় করে থাকে। আবার ভাষার নামকরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের গুরুত্ব অনেক। যুগোস্লাভিয়া ভেঙে যাওয়ার পর একই ভাষা সার্বো-ক্রোয়েশিয়ান ভাষা ক্রোশিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোতে রাষ্ট্রের নামে পরিচিত হতে শুরু করেছে।

একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকে যা রাজনৈতিক পালাবদলে পরিবর্তিত হয়। রুশ শব্দ 'মির'-এর তিনটি অর্থ : গোষ্ঠী, জগৎ ও শান্তি। রাশিয়ায় একসময় মানুষ যে 'মির'-এ 'শান্তি'তে বাস করত তা-ই ছিল তাদের 'জগৎ'। বিদেশী হামলায় শান্তি বিঘ্নিত হলে মানুষ বনে পালিয়ে যেত। ভাষা হারিয়ে গেলে শব্দের এ-ধরনের বহুর্থক দ্যোতনা এমনভাবে বিনষ্ট হবে যা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। একটি ভাষা হারিয়ে গেলে যে শুধু তার কবিতা ও ছন্দ হারিয়ে যায় না, মানুষের সর্বজনীন ব্যাকরণ তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অথচ বিরল উপাদানও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। হারিয়ে যেতে পারে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিরাময়বিধান, ওষুধ-অনুপান।

যে-মাতৃভাষায় কথা বলে তাঁরা অবজ্ঞা বা উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন বা কর্মক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েছিলেন, পিতামাতা সেই ভাষা শিখতে ছেলেমেয়েদের নিরুৎসাহিত করতে পারেন। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা শিখলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সুযোগ-সুবিধা ভোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠরা সেই ভাষা শিখতে উৎসাহিত বোধ করবে।

ছেলেমেয়েরা ভালো করে কেবল একটিমাত্র ভাষা শিখতে পারে এই ভেবে পিতামাতারা তাদেরকে অনেক সময়ে মাতৃভাষার চেয়ে অধিকতর মর্যাদাবান ভাষা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ভাষাবিদরা বলছেন, এটা ঠিক না। শিশু-কিশোরদের একাধিক ভাষা শেখার বেশ ক্ষমতা রয়েছে। শেখার জন্য শৈশব-কৈশোর হচ্ছে প্রশস্ত সময়।

স্কুলে ভাষার শিক্ষার ধরন বা বিশেষ ভাষাকে প্রাধান্যদান মাতৃভাষা বা দ্বিতীয় ভাষার ওপর অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। যখন কোনো ভাষা

জাতীয় বা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা পায় তখন তার বেশ উন্নতি ঘটে। কোনো কোনো দেশে সরকার সরাসরিভাবে সংখ্যালঘুদের ভাষার ব্যবহার নিষেধ করে থাকে। গ্রিসে ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায় কথা বলা বা গান করা নিষিদ্ধ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিন্ডিয়ানদেরও এমন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সেখানে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা বেশি সেখানে পরিবার ছাড়া অন্য কোনোখানে যখন মাতৃভাষা বলা হয় না, তখন সেই ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

স্কুলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রেডিও-টেলিভিশনে মাতৃভাষার ব্যবহার, মাতৃভাষায় অভিধান, কোষগ্রন্থ ইত্যাদি প্রণয়ন এক বিপন্ন মাতৃভাষাকেও সঞ্জীবিত করতে পারে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পিতামাতা যদি তাঁদের সন্তানসন্ততির সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলেন এবং তাদেরকে তাতে সবক দেন।

ইন্টারনেটে ইংরেজির দোর্দণ্ডপ্রতাপে অন্যভাষা কোণঠাসা। টেলিযোগ ও তথ্যপ্রকৌশলের বদৌলতে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও এশীয় ভাষার প্রচার ও প্রসার যেমন সহজ হয়েছে তেমনি বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও চেতনা-সংরক্ষণে ভাষাভিত্তিক সংযোগরক্ষায় এই তথ্যবিপ্লব আজ বড় সহায়ক। কেলটিক ভাষা দক্ষতার সঙ্গে ওয়েবপেজ ব্যবহার করছে।

সারা বিশ্বে ভাষাবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে পরভাষা বা অ-মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভিত্তিক সম্প্রদায়ের দাপটে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীরা নিজেদেরকে বড় বিপন্ন মনে করেছে। বহুভাষী রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বোচ্চ আদালতে ভাষা নিয়ে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

একটি ভাষা মৃত বলে বিবেচিত হয় যখন সেই ভাষায় কথা বলার কেউ থাকে না। বিপন্ন ভাষা শনাক্ত করার সুনির্দিষ্ট কোনো সূত্রনির্দেশনা না থাকলেও কতগুলো উপাত্ত প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া হয় : যে-ভাষায় লোকে কথা বলে তাদের সংখ্যা, দেশী ভাষায় যারা কথা বলে বা স্বচ্ছন্দে কথা বলে তাদের গড় বয়স ও সর্ববয়ঃকনিষ্ঠ প্রজন্ম যারা সেই ভাষায় কথা বলতে শিখেছে তাদের একটি শতকরা হিসাব।

যে-ভাষায় মাত্র শ'খানেক লোক কথা বলেন এবং যাঁদের সকলেরই বয়স ৯০-এর উপরে এবং কোনো কিশোর-যুবক সেই ভাষা আর শিখছে না সেই ভাষা বিপন্ন বটে। মারাত্মকভাবে বিপন্ন ভাষা হচ্ছে সেই ভাষা যে-ভাষায় যারা কথা বলে তাদের বেশির ভাগের বয়স বা দাদার দাদার বয়স সত্তরের ওপর। বড় বিপন্ন ভাষায় কথা বলে চল্লিশ বছর ও তার চেয়ে বয়সে বেশি দাদা-দাদি বা নানা-নানিরা। ২০ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের পিতামাতারা কেবল বিপন্ন ভাষায় কথা বলে।

জাপানের ভাষা আইনু (Ainu) একটি বিপন্ন ভাষা। প্রায় ৩০০ জন মানুষ সেই ভাষায় কথা বলে। শতকরা ১৫ জন সেই ভাষা সক্রিয়ভাবে কাজকর্মে ব্যবহার করেন। সামান্য কয়েকজন যুবক সেই ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেছে।

ইন্দোনেশিয়ায় এমন ভাষা রয়েছে যে-ভাষায় দশ হাজারের বেশি লোক কথা বলে, কিন্তু শিশু-কিশোরেরা তা আর শিখছে না। সেই ভাষায় যাঁরা এখনো কথা বলেন তাঁরা সরকারি বা জাতীয় ভাষা শিখতে বেশি উদ্যোগী। একশো জনের ভাষাও সহিসালামতে বেঁচে আছে ধরা যাবে, যদি তা সমাজের প্রাথমিক ভাষা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সকল শিশু-কিশোরের তা প্রথম বা একমাত্র ভাষা হয়ে থাকে। যে-ভাষায় একটি সমাজের শিশুরা ও অন্যরাও প্রত্যাশিতভাবে কথা বলে সেই ভাষা বিপন্ন নয়।

আসলে একটি ভাষায় কতজন কথা বলে, তার চেয়ে যারা সেই ভাষায় কথা বলে তাদের বয়স কত, তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি নৃগোষ্ঠীর কত লোকের মধ্যে কতজন সেই ভাষায় কথা রাখার জন্য বেঁচে আছে। পঞ্চাশ বছরের ওপর পাঁচ হাজার লোক এখন ব্রতঁ Breton ভাষায় কথা বলতে পারে, কিন্তু যেহেতু ২৫ বছরের নিচে দুই হাজারেরও কম লোক সে-ভাষা ব্যবহার করে, সেখানে আগামী পঞ্চাশ বছরে তা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেখানে ৩০ হাজার লোক একটি ভাষা বলে এবং প্রায় সব শিশু-কিশোর সেই ভাষা মাতৃভাষা হিসেবে তালিম করে একবিংশ শতাব্দীতে সে-ভাষা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

এক প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ লুপ্ত হলে পরিবেশবিদরা দুঃখ করেন। একটি মুমূর্ষু ভাষা আমাদের অনেক কাছের। এর মৃত্যু হলে মানুষের এক অনন্য সৃষ্টি বিলুপ্ত হবে। একটা সমাজে মানুষের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডকে ঘিরে একটা ভাষার জন্ম হয়। প্রত্যেক ভাষার মধ্যে শব্দ, খণ্ডবাক্য, বাক্যাংশের একটি জটিল কাঠামো রয়েছে। প্রত্যেক ভাষায় বৈপরীত্য, পার্থক্যবিচার ও মতৈক্য প্রকাশ থেকে সাধারণ কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায় ও সংলাপে একটা বিশেষ ও বৈচিত্র্যময় ধারা ও ঢং লক্ষ করা যায়। নানাধরনের বর্গীকরণে, প্রতিশব্দ, বিপরীত শব্দ, মিল-অমিল, ব্যতিক্রম, বিরল-প্রয়োগ ও নিপাতনে সিদ্ধি ইত্যাদির ব্যবহারে একটি ভাষা স্বকীয়তা লাভ করে। স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এক বিশেষ লিপিমালার আধারে। আমরা অনেকে জানি না, ভাষাবিদরা বলছেন, পৃথিবীতে নতুন ভাষার জন্ম হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও নতুন ভাষার জন্ম হবে। ভাষার সব হদিস আমরা জানি না।

মানুষ ভাষা ব্যবহার করে নিত্যকার দৈনন্দিন নানা কথা-চালাচালির জন্য। অতীত-বর্ণনা, কল্পিত কাহিনী, বর্তমানের জিজ্ঞাসা ও সমস্যা এবং তার উত্তর ও সমাধান, ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পরিকল্পনায়, কবিতার আবৃত্তি, কাহিনীর আখ্যানে এবং সংগীতের সুর ও ছন্দে ভাষার নানান ব্যবহার। ভাষার মৃত্যুর আগে তিনটি উপসর্গ দেখা যায়। আগের চেয়ে কম লোকে ওই ভাষায় কথা বলছে, কম লোকে ওই ভাষা ব্যবহার করছে এবং ওই ভাষার কাঠামোগতভাবে সরলীকরণ

ঘটছে। যেখানে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লোক ভাষা ব্যবহার করে সেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মগত প্রয়োজনের তাগিদে পিতামাতার কাছ থেকে সন্তানসন্ততিদের মাঝে ভাষার পাঠান্তর ঘটে।

মুমূর্ষু ভাষা হচ্ছে সেই ভাষা যেখানে ছেলেমেয়েরা সেই ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে না। যে-ভাষা শুধু সামাজিকভাবে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ, সন্তান-সম্ভাবনার বয়স অতিক্রম করেছেন এমনসব ব্যক্তি কেবল কথা বলার জন্য ব্যবহার করেন, সেই ভাষার দিন ফুরিয়ে এসেছে। অনেক সময়ে লোকাভাবের জন্য বিপন্ন ভাষায় লোকে কথাবার্তা পরিবার বা অনুষ্ঠান-উৎসবে সীমাবদ্ধ রাখে।

সেই ভাষা বিপন্ন যা ছেলেমেয়েরা এখনো শেখে, কিন্তু বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে সেই ভাষা আর কেউ শিখবে না। যে-ভাষা রাষ্ট্রের আনুকূল্য পায় এবং বহুলোকে ব্যবহার করে সে-ভাষা নিরাপদ বটে।

কিছু ভাষাবিদরা মনে করেন, ভাষা যদি মরে যায়, কান্নাকাটি করে লাভ নেই। ভাষার যে-পরিবর্তন ঘটে তাকে ঠেকানো সহজ নয়। মুমূর্ষু ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিদরা সুপারিশ করছেন, যতদূর সম্ভব সেই ভাষার সব তথ্য আহরণ করে তা রেকর্ড করা হোক।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পেশ করলে আরও ২৬টি দেশ সেই প্রস্তাবে শরিক হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে সেই দিনটি আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালনের জন্য কয়েকটি পশ্চিমা দেশ তেমন কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি। ১৮৮৬ সালের ১ মে শিকাগো শহরে শ্রমিক-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে যে সারা পৃথিবীতে মে-দিবস পালিত হচ্ছে সেই নজির উত্থাপন করা হলে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি আর তেমন জোর পায় না। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সর্বসম্মতভাবে ইউনেস্কোর প্রথম ও দ্বিতীয় কমিশন বাংলাদেশের প্রস্তাব মেনে নেয়।

একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ফলে আমাদের দায়িত্ব বেড়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মাতৃভাষার ব্যবহার ও স্বীকৃতির জন্য যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের কর্মকাণ্ডে এক গভীর কর্তব্যবোধে আমরা সহযোগিতা করব। ইউনেস্কোর ভাষাবিষয়ক প্রকল্প ও পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা-গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আমাদেরকে শুধু বাংলা ভাষা নয়, বাংলাদেশের সীমানায় অন্তর্ভুক্ত সকল ভাষার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের দেশের ভাষার একটা জরিপ হওয়া দরকার। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং হিমালয় অঞ্চলের ভাষা শেখার একটা প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন এ-ব্যাপারে কিছু দিকনির্দেশনা দিলে রাজশাহীতে উত্তরাঞ্চলের, চট্টগ্রামে

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের, সিলেটে উত্তরাঞ্চলের এবং খুলনায় দক্ষিণাঞ্চলের ভাষার ওপর কিছু কাজ করা যেতে পারে।

বাংলা একাডেমী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সংকলিত *অঞ্চলিক ভাষার অভিধান* প্রকাশ করে একটি বড় কাজ করেন। নানা কারণে শব্দের জন্ম ও মৃত্যু হয়। অনাদর তার মধ্যে অন্যতম। আঞ্চলিক ভাষার একটা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান দেশের বারোটি অঞ্চলের ১৫৫০টির অধিক শব্দ নিয়ে ১৯৯২ সালে *দ্যুতিময় এই শব্দগুলো* শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। যেসব শব্দ কালক্রমে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে লিখিতভাবে তা নিবদ্ধ করতে গিয়ে খান সাহেব একটি বড় দরদের কবিতা লেখেন :

ওরা কারা?
আবছা আলোর মাঝে আলো তমসায়
অনাদরে ওই কারা ঘুরিয়া বেড়ায়?
মুকুতার ছটা বুকে, তনু মধুময়;
তবু ভয় তিলে তিলে পাবে তারা লয়।
তারা বলে: 'ভেবে দেখ, করো হে বিচার,
যদি মোরা ঝরে যাই, বেশী ক্ষতি কার?
আমাদের তুলে নাও, করো সমাদর;
দ্যুতি দেব চিরদিন হইয়া অমর।'

পরভাষার প্রতি এক পরম আত্মীয়তা ও সহিষ্ণুতায় আমরা সমস্বরে বলতে চাই, 'ভাষার নীহারিকার প্রতিটি বর্ণ এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।'

কালি ও কলম ফেব্রুয়ারি ২০০৫

একভাষিতা ও বহুভাষিতা

পৃথিবীর সর্বত্র—দেশে-মহাদেশে—বহুভাষিক জাতি রয়েছে। উদাহরণ দিতে গেলে এক লম্বা ফিরিস্তি হবে। মানবেতিহাসে বহুভাষিতাই সাধারণ, একভাষিতা বিরল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০ ভাগ লোক নিয়মিতভাবে ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করে। যুক্তরাজ্যে তিনশোরও বেশি ভাষায় লোকে কথা বলে। জাপান একদিক থেকে সবচেয়ে একভাষী দেশ। সেখানেও চীনা ও কোরিয়ান ভাষার চল রয়েছে। ঘানা ও নাইজেরিয়ায় যেখানে একটিমাত্র সরকারি ভাষা, সেখানে শতকরা ৯০ ভাগ লোক একাধিক ভাষা ব্যবহার করে। মজার ব্যাপার, বহুভাষী চারিত্র্যকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় এখন সরকারি ভাষার সংখ্যা দশটি।

আজ একভাষী জাতি বা রাষ্ট্র ঢুঁড়ে বের করা মুশকিল। তবে একভাষিতার প্রতি জাতীয়তাবাদী নেতা বা গোষ্ঠীর একটা দুর্বলতা রয়েছে। এক বা অভিন্নের প্রতি আকর্ষণ বা দুর্বলতায় বহু মানুষ যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছে, তেমনি তার ফলে তাদের বিড়ম্বনাও বৃদ্ধি পেয়েছে অভাবিতরূপে। কল্পনায় বা হেঁড়েগলায় আওয়াজ তুলতে ভালোই লাগে—এক ধর্ম এক ভাষা এক জাতি। অনেক সময় একই প্রবণতায় একদলীয় সরকার গঠনের চেষ্টা হয়। একাভাষিতার পক্ষে বহুদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণত সরকারপক্ষ থেকে একভাষিতার জন্য চাপ দেওয়া হয়। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ দেশেরও কম হবে, যেখানে সরকার একাধিক ভাষাকে অফিসের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের নিজের ভাষা, নিজের জন্মভাষা বা মাতৃভাষার প্রতি টান থাকে। সেই ভাষার প্রতি আনুগত্যে প্রত্যেক মানুষ একদিক থেকে একভাষী। নিজেকে প্রকাশ করতে যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজেকর্মে সে আবার অন্য ভাষার দ্বারস্থ হয়, তাকে দ্বিভাষী বা বহুভাষী হতে হয়।

অনেক দেশের নাম ভাষার নামে। জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, রাশিয়া, চীন, জাপান, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশের নাম মনে এলে এমন

মনে হয় যে, সেসব দেশে একমাত্র ভাষা হিসেবে যথাক্রমে জার্মানি, ফরাসি, স্প্যানিশ, ডেনিশ, সুইডিশ, নরওয়েজিয়ান, রুশ, চীনা, জাপানি বা বাংলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। আসলে এসব দেশও বহুভাষী। ওইসব দেশে আইনে বা সংবিধানে সরকারি বা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে একটি ভাষার উল্লেখ থাকলেও সেসব দেশে সংখ্যালঘু একাধিক ভাষা রয়েছে। একটি ভাষার স্থলে অন্য একটি ভাষা প্রতিস্থাপিত হলে একটি সংস্কৃতির বিনাশ ঘটতে পারে। শিশুর শিক্ষায় বড় ব্যাঘাত ঘটায়। পড়া বা লেখার পূর্বেই শিক্ষকের ভাষা শেখার জন্য তাকে প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হয়। রাজ্যজয়, যুদ্ধ বা জাতিগত শুদ্ধি-আন্দোলন, ধর্মীয় নিপীড়ন বা পুনর্বাসনের কারণে বহুভাষিতার উদ্ভব হতে পারে।

একভাষিতার সুবিধার কথা ভেতেই তার আকর্ষণ। যে-কোনো প্রশাসনে বহুভাষিতা একটা অতিরিক্ত ঝকমারি, যা বিদঘুটে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কানাডায় ইংরেজি-ফরাসি দ্বিভাষিতায় যে-অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, প্রায় অনুরূপ অবস্থায় বেলজিয়ামে ফ্লেমিশ-ফরাসি অন্তর্দ্বন্দ্বে সরকারের পতন হয়। তবু রক্ষে, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ-যন্ত্রপাতির বদৌলতে বাবেলের টাওয়ারেও এখন শান্তিপ্রিয় সম্মেলন করা সম্ভব।

অদ্বৈতবাদিতার মতো একভাষিতা অনেক সময় দুর্মর গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। রোমন্টিকতার প্রভাবে একভাষীদের হাতে তাদের নিজের ভাষা সম্পর্কে একটা আধ্যাত্মিক-পারমার্থিক ঊর্ধ্বপাতন ঘটে। সহিষ্ণুতার অভাবে দাঙ্গাহাঙ্গামাও বেধে যায়।

বেশির ভাগ বহুভাষী-সমাজে ভাষার ব্যাপারে একটা তারল্য থাকে। আন্তঃসম্পর্ক বদলে যায়। কোনো কোনো সমাজে দ্বিভাষিতা, আবার কোনো কোনো দেশে—যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায়—একভাষিতা বৃদ্ধি পায়। কোথাও সমৃদ্ধ ভাষার সঙ্গে পাল্লা দিয়েও কোনো কোনো ভাষা টিকে থাকে। আবার কোথাও প্রধান ও প্রভাবশীল ভাষার সঙ্গে স্বল্পব্যবহৃত ভাষা হারিয়ে যায়। ভাষার যেমন মৃত্যু হচ্ছে, তেমনি তার বুলি বদলে ক্রেওল বা পিজিন হচ্ছে।

একসময়ে সংস্কৃত দেবভাষা বলে বিবেচিত হতো। কট্টর সংস্কৃতভাষীরা আর্য ছাড়া অনার্যকে সে-ভাষায় শিক্ষা দেবে, তা ভাবতেও পারত না। কোনো শূদ্র অসাবধানেও যদি সে-ভাষা শুনে ফেলত, তা হলে তার কানে তপ্ত সিসে ঢেলে দেওয়ার ন্যাকি একটা বিধান ছিল।

আরবি ও হিব্রু স্বর্গের ভাষা বলে নন্দিত হতো। বিজাতীয় বা বিদেশী মানুষ ও ভাষার প্রতি মানুষের যেমন কৌতূহল, অবজ্ঞা বা অনাদরের ভাবও তেমনি পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক কারণে ও প্রতিযোগিতায় ভিন্নভাষী যদি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দেয়, তা হলে তো তার প্রতি সহমর্মিতার পরিবর্তে ঈর্ষা, এবং আস্থার পরিবর্তে সন্দেহের ভাব দেখা দেয়।

আইনে সমতা, আইনের সমক্ষে সমান আশ্রয় এবং বাকস্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সকল ভাষার—বহুলপ্রচলিত বা স্বল্পব্যবহৃত—অধিকার বিশ্ব আন্তর্জাতিক সনদে স্বীকৃত হয়েছে। কলোম্বিয়া ও ব্রাজিলের সীমান্তে উত্তর-পশ্চিম আমাজনে যে-টুকানো সম্প্রদায় বাস করে সেখানকার পুরুষদের ভিন্নভাষী সম্প্রদায়ে বিয়ে করতেই হয়। তাদের সংস্কার, ভাষাভাষী কন্যাকে বিয়ে করলে নিজের বোনকে বিয়ে করা হয়, দুজনের মাতৃভাষা তো অভিন্ন! বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর ঘরে যায়। এর ফলে বেশির ভাগ গ্রামবাসী বহুভাষী। ছেলেমেয়েরা বহুভাষী সমাজে বাবা ও মায়ের ভাষায় কথা বলে। এক গ্রামের লোকেরা অন্যগ্রামে গেলে নিজের ভাষায় কথা বলা লোকের অভাব হয় না। টুকানোদের মধ্যে বহুভাষিতা এমনই সহজ ও স্বাভাবিক যে, তারা বাইরের লোকের কাছে বলতে পারে না, কত ভাষায় বা ভালোভাবে কোন ভাষায় তারা কথা বলতে পারে।

টুকানোর মতো অনেকটা নিউগিনির Siane (সিয়ানে?) সম্প্রদায়। একাধিক ভাষা জানা তাদের জন্য একটা মামুলি ব্যাপার। প্রত্যেক ব্যাপারে সবচেয়ে যে-ভাষায় কথা বলা সমীচীন তারা সেই ভাষায় কথা বলে। তাদের ভাষাশিক্ষার কৌশল এমনই রপ্ত হয়েছে যে, একদল শ্রমিক উপকূলে কাজ করতে গিয়ে টক পিজিন শিখেছিল। গ্রামে ফিরে বাকি সব পুরুষের জন্য তারা টক পিজিন বা পিজিন ইংলিশের একটা স্কুল খুলে দেয়।

বহুভাষিতার উলটো ব্যাপার ঘটে প্যারাগুয়েতে। স্পেনীয়রা সেই দেশ জয় করে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের লোকসংখ্যা ছিল কম এবং স্পেনীয় ভাষার প্রতাপ তেমন ছিল না। স্থানীয় আমেরিকান ভাষা গুয়ারানির ঋদ্ধিবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। এখন শতকরা নব্বইজন লোক সেই ভাষায় কথা বলে এবং জাতীয় ভাষা হিসেবে তা স্বীকৃত। বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়েদের স্প্যানিশ শেখাতে চায় শিক্ষার সুযোগ ও সাংসারিক উন্নতির জন্য। শতকরা সাতজনের ভাষা স্প্যানিশ সরকার ও শিক্ষার ভাষা। প্রাথমিক শিক্ষায় অবশ্য গুয়ারানির ব্যবহার বেড়েছে। প্যারাগুয়ের রাজধানী আসানশিওন এক দ্বিভাষিক শহর, কিন্তু গ্রামের দিকে লোকে গুয়ারানিই বলে। উঁচুতলার জন্য স্প্যানিশ, নিচুতলার জন্য গুয়ারানি। আনুষ্ঠানিকতায়, সাজগোজ, বিদেশীর সঙ্গে এবং ব্যবসায়সংক্রান্ত ব্যাপারে স্প্যানিশ। বকুবাকর, চাকরবাকর, সাদামাটা পোশাকপরা বিদেশীরা সঙ্গে গুয়ারানিরই চল। পাদরির কাছে নিজের দোষজ্ঞাপন করে অনুতাপের সময়, হাসিঠাট্টা-মশকরা বা ভালোবাসাবাসির সময় বা অনানুষ্ঠানিক হালকাচালে কথা চালচালির জন্য গুয়ারানি। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তো বটেই, এমনকি উঁচুতলার পুরুষরাও হামদরদি দেখানোর জন্য লোকের সঙ্গে কথা বলে গুয়ারানিতে। পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি ও খেলার মাঠে গুয়ারানি বলে। প্রেমের শুরু স্প্যানিশে, শেষ গুয়ারানিতে। কিন্তু পুরুষরা যখন মদ খেয়ে মাতাল হয় তখন বেশি বেশি করে

স্প্যানিশ বলে। আবার ঠিক তালে থাকলে ব্যবসার কথা চালানোর জন্য স্প্যানিশ।

স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস কী সঠিক কথাটাই বলেছিলেন! ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইংরেজি, সৈনিকদের সঙ্গে জার্মান, মহিলাদের সঙ্গে ফরাসি, বন্ধুদের সঙ্গে ইতালিয়ান এবং ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্য স্প্যানিশ!

ভারতের মহারাষ্ট্রের কাপওয়ার গ্রামের ভাষা নিয়ে ভাষাবিদ গামপেরজ ও উইলসন বলছেন সেখানে চারটি ভাষা চালু—মারাঠি, উর্দু, কানাড়া ও তেলেগু। প্রথমদুটো ইন্দো-ইউরোপীয় এবং শেষের দুটো ভিন্ন। বর্ণাশ্রম প্রথার প্রভাব রয়েছে ভাষার ক্ষেত্রেও। উঁচুশ্রেণীর জৈনরা কানাড়ায়, অস্পৃশ্য হরিজনরা মারাঠিতে, কিছু পেশাগোষ্ঠী তেলেগুতে এবং মুসলমানরা উর্দুতে কথা বলে। আন্তঃসাম্প্রদায়িক কথাবার্তা চলে মারাঠিতে। দ্বিভাষী তো বটেই, পুরুষদের অনেকেই ত্রিভাষী।

অস্ট্রিয়ায় বুর্গেনলান্ডের এক গ্রাম নিয়ে এক গবেষণায় দেখা গেছে সেখানে লোক গ্রামে হাঙ্গেরিয়ান এবং শিল্প-এলাকায় জার্মান বলে। হাঙ্গেরিয়ানের চেয়ে জার্মান অনেক বেশি মর্যাদা পায়। তরুণীরা হাঙ্গেরিয়ানভাষী তরুণদের তেমন পছন্দ করে না।

জার্মানরা তাদের ভাষার ব্যাপারে একটু বেশিমাত্রায় শৃঙ্খলাবাগীশ। বার্লিনের এক স্কুলে জার্মান ভাষার জন্য নিয়ম করা হয় যে, শুধু স্কুলেই নয়, স্কুলের বাইরেও ছেলেমেয়েদের জার্মান বলতে হবে, অন্য কোনো ভাষা নয়। আর এ-ব্যাপারে রাজনীতিকদের মধ্যে তেমন কোনো মতদ্বৈধ নেই। জার্মান ভাষা শেখার জন্য স্কুলের বাইরেও ছাত্রদেরকে অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতে নিষিদ্ধ করা ঠিক হচ্ছে? এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার সংস্পর্শ ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না। মানুষের মেধার অশেষ ক্ষমতা রয়েছে ভাষা শেখার। আর তেমন কোনো বোধগম্য বা গ্রহণযোগ্য কারণ নেই যে, কেউ দুটো বা একাধিক ভাষা রপ্ত করতে পারবে না। ভাষা শেখার ব্যাপারে যারা একেবারেই আড়ষ্টবুদ্ধি তাদের কথা অবশ্য আলাদা।

তুর্কি, গ্রিক, ইতালি ও বলকান রাষ্ট্রগুলো থেকে প্রায় আড়াই কোটি অতিথি শ্রমিক ও বিভিন্ন দেশের কয়েক লাখ বিদেশী ছাত্রের বদৌলতে উত্তর ইউরোপে নানাভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। শিশুদের শেখার বিশেষ ব্যবস্থায় অনুবাদক ও দোভাষদের কর্মকাণ্ডে বহুভাষিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০ নভেম্বর ১৯৯৪ আঞ্চলিক বা সংখ্যালঘু ভাষার সংরক্ষণের জন্য ইউরোপীয় চার্টার বা সনদ মন্ত্রীদের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতক্রমে গ্রহণ করেন। প্রস্তাবনায় ইউরোপীয় কাউন্সিল সদস্য-রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যের জন্য ঐতিহাসিক, আঞ্চলিক বা সংখ্যালঘু ভাষা ব্যক্তিগত জীবনে ও সরকারিভাবে প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে পারে এবং গণতন্ত্রের আদর্শ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের

ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও রাজ্যিক সংহতির কাঠামোর মধ্যে আন্তঃসাংস্কৃতিক ও বহুভাষিতার মূল্য সংরক্ষণের জন্য ওই সনদের সমর্থনে উদ্যোগ করা হয় জাতি, জনজাতি, ধর্ম ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার-রক্ষণে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯২ জাতিসংঘের ঘোষণা। স্বল্পব্যবহৃত ভাষার জন্য ইউরোপীয় ব্যুরো (EBLUL) প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে।

এইসব আইনি বিধান ও প্রয়াস সত্ত্বেও পশ্চিমে ভাষাগত বৈষম্য লক্ষ করা যায়। 'প্রজাতন্ত্রের একমাত্র ভাষা ফরাসি'—এই শতাব্দীপ্রাচীন নীতি ফ্রান্সে বহুজনে অনুসরণ করে। ১৯৮১ সালের ১৪ মার্চে ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিতর্যাঁ বলেছিলেন, সময় এসেছে যখন সংখ্যালঘু ভাষা ও সংস্কৃতিকে আমাদের মর্যাদা দিতে হবে। ফ্রান্স ইউরোপের সেই শেষ দেশ, যেখানে সেই দেশকর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক সমঝোতা-চুক্তিতে স্বীকৃত সংখ্যালঘু ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক অধিকার থেকে তার নাগরিকদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। ১৯৯৪ শিক্ষামন্ত্রী ফ্রান্সিস বেরু (Frances Bayrou) ফ্রান্সের প্রথম সরকারি প্রতিনিধি যিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দেন যে, একভাষিতার যুগ শেষ এবং ফ্রান্সে আঞ্চলিক ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেও ফরাসি ভাষা রক্ষা করা সম্ভব।

ইউরোপে বড় ধরনের আন্তর্জাতিক সামরিক সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে পারলেও একভাষী অসহিষ্ণুতাসঞ্জাত সহিংস অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এড়াতে পারেনি। গ্রেট ব্রিটেনে আইআরএ (IRA), স্পেনে এটা (ETA), কর্সিকায় জাতীয়তাবাদীরা এবং ওয়েলসে তরুণেরা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে ইতস্তত বোধ করেনি।

একভাষী কুইবেক প্রদেশের ফরাসিভাষীরা কানাডায় একটিমাত্র ভাষার আইন চালু করার চেষ্টা করে, কিন্তু সে-দেশের সর্বশেষ আদালত প্রস্তাবিত বিধানকে আইনবহির্ভূত বলে রায় দেন। কুইবেকে ফরাসি একভাষীদের অসহিষ্ণুতা এই পর্যায়ে গিয়েছিল যে, ফরাসি ভাষায় লেখা না থাকার জন্য ক্রিসমাসের গিফ্‌ট্ প্যাকেট পর্যন্ত ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একসময়ে জার্মান ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা উঠেছিল। এ-ব্যাপারে সে-দেশের অন্যতম স্থপতি-পিতা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-৯০) ১৭৫৩ সালে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, 'জার্মান অভিবাসীরা ইংরেজি শিখছে না। জার্মান জাতির মধ্যে যারা সবচেয়ে বুদ্ধিহীন তারাই আসছে আমেরিকায় ... এবং সংখ্যায় তারা শিগ্‌গির আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাবে এবং আমার মনে হয় আমাদের সব সুবিধা সত্ত্বেও আমরা নিজেদের ভাষা সংরক্ষণ করতে পারব না এবং আমাদের সরকার এক নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়বিংশতিতম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট (১৮৫৮-১৯১৯) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'এখানে আমাদের কেবল একটি ভাষার জন্য স্থান রয়েছে এবং তা হচ্ছে ইংরেজি, কারণ আমরা চাই মূষা থেকে আমাদের জনগণ বহুভাষী বোর্ডিং-হাউসের বাসিন্দা হিসেবে নয়, বরং আমেরিকান

জাতীয়তার ভেতর থেকে আমেরিকান হয়ে বেরিয়ে আসবে। আর আমাদের একটিই পতাকা থাকতে হবে। আমাদের ভাষাও একটি থাকতে হবে। সেই ভাষা হবে স্বাধীনতার ঘোষণার ভাষা, ওয়াশিংটনের বিদায়ী ভাষাণের ভাষা, লিনকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতার ভাষা এবং তাঁর দ্বিতীয় উদ্বোধনীর ভাষা।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্র বা সরকারি ভাষার কোনো বিধান নেই। অন-ইংরেজিভাষীদের ক্রমবর্ধমান দাবির প্রতিক্রিয়ায় ও উত্তরে কানাডায় ইংরেজি-ফরাসির দ্বন্দ্বে শঙ্কিত হয়ে সে-দেশে ইংরেজিকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি ও উৎসাহদানের প্রশ্ন ওঠে। ১৯৭১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর হায়াকাওয়া, যিনি দ্বিভাষিক শিক্ষা ও দ্বিভাষিক ভোটপত্রের বরাবর বিরোধিতা করেন, সিনেটে সংবিধান-সংশোধনের একটি বিল আনেন। তাঁর বিল পাশ হলে ইংরেজি শুধু সরকারি ভাষাই হতো না, ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্যের আইন ও বিধিবিধানে অন্য ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যেত। ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে সাংবিধানিক সংশোধনের বিল নবতি-সপ্তম কংগ্রেসে পাশ করা সম্ভব হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু অন-ইংরেজিভাষীরা তাদের মাতৃভাষার সঙ্গে সামান্যই সম্পর্ক রাখে এবং দ্বিতীয় প্রজন্মে সেই সম্পর্কটুকুও মিলিয়ে যায়। তবু শতকরা ১০ ভাগ লোক নিয়মিতভাবেই ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক অভিবাসীর ধারণা যে, ইংরেজি সরকারি ভাষা হলে তাদের ইংরেজি শেখার ও বলার সুযোগ বাড়বে এবং সাংসারিক প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনা থাকবে বেশি। যাঁদের মাতৃভাষা স্প্যানিশ তাঁদের মধ্যে অনেক সময়ে অতিমাত্রায় ইংরেজি-প্রেম লক্ষিত হয়। আবার আশাভঙ্গের দৃষ্টান্তও রয়েছে। ১৯৮৭ সালে ইউএস ইংলিশ সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট স্প্যানিশভাষী লিন্ডা চাভেস সংগঠনের অভ্যন্তরীণ স্মারকলিপিতে স্প্যানিশবিরোধী বক্তব্যে মর্মাহত হয়ে পদত্যাগ করেন। ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষার ব্যবহারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে তো মনে হয় না। দক্ষিণ টেক্সাসে তো নিত্যদিনের ভাষা স্প্যানিশ। টেক্সাস তো বিচ্ছিন্ন হতে চায় না।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক ও জাতীয়বাদী অন্যান্য বহু নেতার মতো পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ একভাষিতার পক্ষে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানে উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' নিখিল ভারত কংগ্রেস যেমন হিন্দি সম্পর্কে ভেবেছিল, তেমনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভেবেছিল উর্দু হবে নতুন দেশের জাতীয়তা ও সংহতির জন্য একটা বড় ভাষিক হাতিয়ার। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রশাসনের ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহারে জিন্নাহর আপত্তি ছিল না। সমগ্র পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একভাষিতার পক্ষে। সেই পাকিস্তান ভাষার কারণে ভেঙে যায়।

ভারতের সংবিধানের ৩৪৩ (১) অনুচ্ছেদে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৪৫ অনুচ্ছেদ-

অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্য নিজস্ব সরকারি ভাষা নির্বাচন করতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রবর্তন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করে দেন। অসমিয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কানাড়া, কাশ্মীরি, তামিল, তেলেগু, পাঞ্জাবি, মালয়ালাম, মারাঠি, সংস্কৃত ও সিন্ধির জন্য সংবিধানে বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। যে-কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তাঁর ক্ষোভের প্রতিকারের জন্য রাজ্যে ব্যবহৃত যে-কোনো ভাষায় নিবেদন পেশ করতে পারেন। সংবিধান-প্রবর্তনের ১৫ বছরের মধ্যে ইংরেজির জায়গায় হিন্দি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজেকর্মে ইংরেজির ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। বহুভাষী ভারতে জাতীয় সংহতির অন্যতম হাতিয়ার ইংরেজি। একভাষিতার প্রয়োজনে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের কাছে হিন্দি তো গ্রহণযোগ্য নয়।

আজ যে-ভাষাটির সবচেয়ে বেশি চল সেই ইংরেজি পৃথিবীর শতকরা ৯২ ভাগ লোকের কাছে পরভাষা। সেই ইংরেজিভাষার সূতিকাগৃহ লন্ডন শহরে আজ ৩০৭টি বিভিন্ন ভাষার লোকে কথা বলে। সেই শহরের ৮ লাখ স্কুল-ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় ৬,০৮,৫০০ জনের মাতৃভাষা ইংরেজি এবং তার পরেই বাংলা-সিলেটি, ৪০,০০০ জনের মাতৃভাষা। ইস্ট লন্ডনের নিউহ্যামের ব্রাম্পটনের এক স্কুলে এক ছত্রছায়ায় ছাত্রছাত্রীরা ৮টি ভাষায় কথা বলে। এই বহুভাষিতায় লন্ডন বা ইংরেজদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তার প্রধান কারণ, অন্য কোনো ভাষা সমাজ বা সাংসারিক প্রতিযোগিতায় ইংরেজির সঙ্গে সমগোত্রীয় প্রাধান্য বিস্ত রিলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। খোদ গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ওয়েলশ বা গেলিক ভাষার প্রতি ইংরেজদের আর তেমন বিরোধিতা নেই। ইংরেজির প্রাধান্য এখন পরম ও অবিসংবাদিত। একটি বহুভাষী রাষ্ট্রে একটা ভাষা যখন কোনো বড় ধরনের স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি না করে নির্বিবাদে প্রাধান্য বজায় রাখে, তখন কোনো গুরুতর ভাষা-সমস্যা হয় না, বরং সেই বহুভাষিতা একটা এমন বৈচিত্র্যের অবকাশ সৃষ্টি করে, যা সমাজের জন্য কল্যাণকর হতেও পারে। বহুভাষিকতা হামলা বা হুমকি নয়, বরং একটা আকর্ষণীয় পরিসম্পৎ।

শিশুদের শিক্ষায় দ্বিভাষিকতা একটা দোটানা ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে, এমন ধারণা বহুলপ্রচারিত। শিশুরা দুটো ভাষা শিখলে দু নৌকায় পা দেবে এবং কোনো ভাষাই শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না। ভাষাবিদদের মতে এ-ধরনের আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দেখা গেছে, দ্বিভাষিক শিশুর জ্ঞান একভাষিক শিশুর চেয়ে মোটেই কম হয় না।

বাংলাদেশে বিশটি ভাষায় মানুষ কথা বলে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা কিন্তু তেমন প্রাধান্য ও উৎকর্ষ লাভ করেনি। দেশের উচ্চ আদালতে রায় বাংলায় লেখা হয় না। উচ্চশিক্ষায় মাধ্যম হিসেবে বাংলা এখনো স্বয়ম্ভর নয়, আমাদেরকে ইংরেজির দ্বারস্থ হতে হয়। ধর্মের জন্য আরবি, পালি বা সংস্কৃত ব্যবহার করা হয়।

বাংলাভাষার ধান-চাল বা নৌকার বহু নাম রয়েছে, যেমন রয়েছে আরব বেদুইনদের উটের বা এস্কিমোদের রয়েছে নানা বরফের নাম। আরবি ভাষায় প্রশংসার দরোজা তিনটি : আল্লাহর জন্য হামদ, তাঁর নবির জন্য নাত এবং আমির-উমরা বা রাজা-বাদশাহর জন্য মাদাহ। লাতিন আমেরিকায় এক আমেরিন্ডিয়ান ভাষায় প্রজাপতির পাখনায় যে-নীল রং, তার জন্য সাতরকম নীলের নাম আছে।

একভাষিতার দাপটে বহুভাষিতার বর্ণাঢ্য বৈশিষ্ট্য যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য আন্তর্জাতিক জগতে এক সুচেতনার সৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যালঘু ও স্বল্পব্যবহৃত ভাষাকে মর্যাদা দান করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। ভাষা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক স্বনামধন্য নাম ড. ডেভিড ড্যালবি। তিনি বলতেন, একভাষিতা নিরক্ষরতার মতোই খারাপ জিনিস, বৈচিত্র্যকে তা অস্বীকার করে। এ-প্রসঙ্গে এজরা পাউন্ডের উক্তি উল্লেখযোগ্য : 'মানুষের সমস্ত প্রজ্ঞা একটি ভাষায় আবৃত নেই এবং মানুষের সব ধরন এবং মাত্রার উপলব্ধি প্রকাশ করার কোনো একটি ভাষা নেই।' একটি ভাষার গুণবিচার করার জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নেই। প্রত্যেকটি ভাষাই অনন্য এবং জটিল। ভাষার মধ্যে জাতিভেদ রয়েছে, কিন্তু ভালো-মন্দ বলে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। দুটো বা তিনটি ভাষার ব্যবহার শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, সমাজের জন্যও একটি শক্তি ও সম্পদ।'

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির সম্মানে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে আজ প্রত্যেক একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এইদিন আমাদের যেমন অহংকারের দিন, তেমনি এক বড় অঙ্গীকারের দিন। সে-অঙ্গীকার শুধু দেশে সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রচলনই নয়, দেশের ভেতরে অন্যান্য সকল ভাষার প্রতি এবং দেশের বাইরে সকল ভাষার প্রতি আজ আমাদের এই অঙ্গীকার যে, সকল ভাষার সংরক্ষণে এবং তাদের পরিচর্যায় আমরা সাধ্যমতো কাজ করে যাব।

কালি ও কলম ফেব্রুয়ারি ২০০৬

আন্তর্জাতিক ঘোষণায় ভাষার অধিকার

মানুষের ভাষার বয়স নাকি সাত হাজার নয়শো বছর। সারা পৃথিবীতে আজ সাড়ে ছয় হাজার ভাষা রয়েছে। মানুষের ভাষার প্রয়োজন নানা কারণে—আত্মরক্ষা, কৌতূহল, শিক্ষণ, তথ্যপ্রমাণ আহরণ, যোগাযোগ, বিনোদন, ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রপাঠ ও বিধিনিষেধ-মান্যকরণ ইত্যাদি। একটি ভাষা একটি সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। কোনো ভাষার কণ্ঠরোধ করা সমীচীন নয়। সভ্যরাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রসীমানায় অবস্থিত প্রত্যেক জনগোষ্ঠী যেন তাদের ভাষা ব্যবহার করতে পারে সেজন্য সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি এবং তার সংরক্ষণ, পরিপোষণ ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মধ্যযুগে ভাষার সঙ্গে জাতির বা জাতিগত আনুগত্য নিয়ে তেমন কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। জাতীয়তাবাদের জন্মের সঙ্গে জাতীয় ভাষার দাবি ওঠে। রুশো বলতেন, রাজনীতির সম্ভাব্যতার পূর্বেই ভাষার বিকাশ ঘটতে হবে। ভাষার ওপর ভিত্তি করে সম্মিলিত ইতালি ও সম্মিলিত জার্মানির অভ্যুদয়। ১৯০৫ সালে নরওয়ে ভাষার জন্যে সুইডেন থেকে আলাদা হয়ে যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবির পেছনে ভাষার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে আবেগময়। ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠনের ফলে সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। ১৯১৯-২০ সালে প্যারিস সম্মেলনে সংখ্যালঘু চুক্তির পর্যালোচনা ও প্রণয়নের সময় ভাষার কারণে যে-বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং নাগরিকদের মধ্যে সমতা যে বিঘ্নিত হয় সেই সমস্যা সম্পর্কে একটা উপলব্ধি দানা বাঁধতে থাকে। সংখ্যালঘু চুক্তিগুলোর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য নানা কারণে সমতা ও অবৈষম্যের নীতি তেমন সাফল্য অর্জন করেনি। পূর্ব ইউরোপের ভাষা নিয়ে এখনো নানান বিতর্ক রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রগুলিতে ভাষাপ্রেম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থানীয় রুশভাষীরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। জাতীয়তাবাদের মধ্যে ফ্যাসিজমের যে-প্রবণতা লক্ষ করা যায় তা যে সংকটকালে প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে তার নিদর্শন বহু।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারীপুরুষ ইত্যাদি ভেদের কারণে মানবসমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা বিশিষ্টতা ও পার্থক্য লক্ষ করি। সমাজবদ্ধ মানুষের ঐকাত্ম্য ও স্বারূপ্যের পরিচয় বহন করে এসব শ্রেণীবিভেদ। এই বিভেদ-বৈভিন্ন্যের জন্য মানবসমাজে সংঘাত ও বিরোধের শেষ নেই। ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা ভাষাপ্রেম ও ভাষাবৈরিতা লক্ষ করি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর জাতিসংঘভুক্ত জনগণ নূতন আশা-উদ্দীপনায় সম্মিলিত জাতিসংঘ নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। জাতিসংঘ সনদের ১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো :

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং এতদুদ্দেশ্যে—শান্তিভঙ্গের হুমকি নিবারণ ও দূরীকরণের জন্য এবং আক্রমণ অথবা অন্যান্য শান্তিভঙ্গকর কার্যকলাপ দমনের জন্য কার্যকর যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক বিরোধ বা শান্তিভঙ্গের পরিস্থিতির নিষ্পত্তি বা সমাধান;
২. বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমঅধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রসার এবং বিশ্বশান্তি দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ;
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মানবিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ সাধন এবং মানবিক অধিকার ও জাতিগোষ্ঠী, নারী-পুরুষ, *ভাষা* বা ধর্ম নির্বিশেষে সবার মৌল স্বাধিকারগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উৎসাহ দান; এবং
৪. এইসব সাধারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জাতিগুলোর প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধনের কেন্দ্র হিসেবে কার্য পরিচালনা।

উল্লেখ্য, ওই উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ভাষাসম্পর্কে সকলের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

সাধারণ পরিষদের কার্যাবলির বর্ণনায় ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : '১. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ পর্যালোচনা করে দেখবে এবং সুপারিশ করবে :

(ক) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্ধন এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশ ও তা লিপিপদ্ধকরণে উৎসাহদান;

(খ) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জাতিগোষ্ঠী, নারী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহ অর্জনে সহায়তাদান।

২. উপরোল্লিখিত ১ (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদের অতিরিক্ত দায়িত্ব, কার্যকর ও ক্ষমতা নবম ও দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হলো।'

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে ৫৫ অনুচ্ছেদে বলা হয় : 'সমঅধিকার ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধিসৃষ্টির ব্যাপারে জাতিসংঘের দায়িত্ব হচ্ছে :

(ক) উচ্চতর জীবনযাত্রার মান অর্জন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সমাধান এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; এবং

(গ) জাতিগোষ্ঠী, নারী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারসমূহ সংরক্ষণ ও সর্বজনীন মর্যাদা অর্জন করা।

মৌলিক স্বাধিকার সমূহ সংরক্ষণ ও সর্বজনীন মর্যাদা অর্জন করা।

একসময় দক্ষিণ এশিয়ায় শূদ্রদের সংস্কৃত ভাষা শুনতেও বাধানিষেধ ছিল। কিংবদন্তি এই যে, কোনো শূদ্র অসাবধানে সংস্কৃত ভাষা শুনে ফেললে তার কানে গরম সিসা ঢেলে শাস্তি দেওয়া হতো। অপরদিকে ভাষা শেখাতে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রতিপত্তিশলী ব্যক্তিদের দৌরাত্ম্যও কিছু কম ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণী অঙ্গরাজ্যগুলোতে যেসব কৃতদাস ইংরেজি বলতে পারত না, তাদের জিভ নাকি কেটে ফেলা হতো। ১৮৬২ সালে নিউ অর্লিয়ন্স দখল করার সময় জেনারেল বেঞ্জামিন বাটলার কিছু ফরাসিভাষীর শিরশ্ছেদ করেন। অনেকে মনে করেন, ফরাসি ভাষায় কথা বলা নিরুৎসাহ করাই ছিল ওই নৃশংস কর্মের অজুহাত। যখন ব্ল্যাকফুট আমেরিন্ডিয়ানদের বোর্ডিংহাউসে পাঠানো হতো, তখন তাদেরকে তাদের ভাষা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হতো এবং নিষেধ অমান্য করলে বেত মারা হতো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু-কিছু অঙ্গরাজ্য বা স্থানীয় সরকার জার্মান ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করে, যাতে করে ৬ লাখ জার্মান অভিবাসীর জার্মানির প্রতি আনুগত্য বিপজ্জনকভাবে সুদৃঢ় না হয়।

সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব ইদানীং আমরা অনুধাবন করছি। সারা পৃথিবীতে ৬ হাজার ৭০০ ভাষা রয়েছে এবং মাত্র ২২৫টি জাতিরাষ্ট্র রয়েছে। জাতীয় সংহতির জন্য ভাষার ব্যবহার একসময় বৃদ্ধি পায়। এখন ভাষা নিয়ে সংঘাত কিছুটা কমেছে। ভাষা অবশ্য এখনো একটি মহা আবেগের ব্যাপার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতিগত বা ধর্মগত আবেদনের চেয়ে ভাষার আবেদন বড়

হয়ে দেখা দেয়। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, কিন্তু ভাষার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে বাংলাদেশ বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যায়।

১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, রাজনৈতিক অন্যান্য মতাদর্শ, ধনী, গরিব ও জন্মসূত্র নির্বিশেষে সবাই এ-ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার এবং স্বাধীনতার সম-অংশীদার। যে-কোনো স্বাধীন কিংবা স্বায়ত্তশাসিত অথবা সীমিত সার্বভৌম দেশের রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক বিশেষত্বের কারণে ওই দেশের কোনো অধিবাসীর প্রতি কোনোপ্রকার ভিন্ন আচরণ করা যাবে না।'

১৯৬৯ সালের International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

'১. সঠিক উপায়, বিশেষ করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা এ চুক্তিতে বর্ণিত অধিকারসমূহের সম্পূর্ণ প্রগতিশীল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দেশ নিজস্বভাবে এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে তার নিজস্ব সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের পদক্ষেপ নেবে।

২. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতাদর্শ, ধনী, গরিব ও জন্মসূত্র নির্বিশেষে চুক্তিতে বর্ণিত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেবে।

৩. মানবাধিকারসমূহ এবং নিজ দেশের অর্থনীতির ওপর শ্রদ্ধাশীল থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো ঠিক করবে আলোচ্য চুক্তির অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ তাদের দেশের অনাগরিকদের প্রতি কত দূর কার্যকর করা যায়।'

১৯৬৯ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ২৬ ও ২৭ অনুচ্ছেদে, 'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং কোনো পার্থক্য না করে আইনের আশ্রয় পাওয়ার সবার সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতাদর্শ জন্মসূত্রনির্বিশেষে আইন সবার সমান অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং যে-কোনো প্রভেদ সৃষ্টিতে বাধা দেবে।'

২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'যদি কোনো দেশে আঞ্চলিক, ভাষাভিত্তিক অথবা ধর্মীয় এমন জনগোষ্ঠী থাকে, যারা ওই দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ, তাদের ক্ষেত্রে এই অধিকার অস্বীকার করা যাবে না, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংগতি

রেখে তাদেরকেও নিজস্ব সংস্কৃতি উপভোগ, তাদের নিজস্ব ধর্ম অবলম্বন ও প্রচার এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের অধিকার দিতে হবে।'

ক্রমে ক্রমে ভাষার অধিকারের ওপর আন্তর্জাতিক জনমত সোচ্চার হয়। ১৯৯২ সালের জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষার কারণে সংখ্যালঘুদের অধিকারের ঘোষণায় ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের কথা বারবার এসেছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের বিকাশের সহায়তাদানের কথা বলা হয়েছে। ওই ঘোষণায় ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের সংগঠন ও সমিতি রক্ষা করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্র প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার বিকাশ এবং সম্ভব হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে।

১৯৯৫ সালের আদিবাসীদের অধিকারের খসড়া ঘোষণায় আদিবাসীদের নিজেদের ভাষার পুনরুজ্জীবন, ব্যবহার, উন্নয়ন বা সম্প্রচারের অধিকার স্বীকৃত হয়। সম্ভব হলে আদিবাসীরা তাদের ভাষায় তাদের স্বকীয় মিডিয়া মাধ্যম পরিচালনা করতে পারবে। এসব আদিবাসীর অধিকার রাষ্ট্রীয় আইন ও সংবিধানে প্রতিফলিত হতে হবে।

২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের রফিকুল ইসলাম ৮ জানুয়ারি ১৯৯৮ জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনানের কাছে একটি আবেদন করেন। জাতিসংঘের অফিস থেকে বিষয়টি ইউনেস্কোর কাছে সংস্থার পক্ষ থেকে উত্থাপন করার কথা বলা হয়। জনাব রফিকুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগী আবদুস সালাম মাদর ল্যাঙ্গুয়েজেস অব দ্য ওয়ার্ল্ড—বিশ্বের মাতৃভাষা—নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির পক্ষ থেকে সাতটি ভাষায় লিখিত ১০ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসংবলিত একটি আবেদন ইউনেস্কোর নিকট প্রেরণ করা হয়। ইউনেস্কোর শিক্ষাবিষয়ক প্রকল্প বিশেষজ্ঞ মিসেস আনা মারিয়া ওই সমিতিকে জানান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়, তবে যদি কোনো সরকার এ-ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়, তবে ব্যাপারটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্যারিসে ইউনেস্কোর কাছে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করা হয়। বাংলাদেশসহ মোট ২৭টি দেশ সেই প্রস্তাবে শরিক হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম প্যারিস সম্মেলনে প্রস্তাবটি পৃষীত হয়।

সারা পৃথিবীতে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে বাংলাদেশীরা যে-সংগ্রাম করে এসেছে তা একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস পালনের মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করল। বাংলাদেশীদেরকে আজ শুধু নিজের মাতৃভাষার জন্য নয়, সব মানুষের মাতৃভাষার জন্য সমর্থন জানাতে হবে।

কোনো দেশের সংবিধানে আইনের সমক্ষে সমান আশ্রয়ের বিধান থাকলেও বাস্তবে সরকারি কর্তৃপক্ষ, সম্প্রদায়গত বা ব্যক্তিগতভাবে কোনো বেসরকারি সংস্থা বৈষম্যের কারণ হতে পারে। সমতা-নীতির সমর্থনে বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জনহিতকর মামলার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সব বৈষম্য আপত্তিকর নয়, যদি তা যুক্তিযুক্ত এবং বিষয়ভিত্তিক এবং ন্যায্য লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে তা করা হয়ে থাকে।

জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের জাতিসংঘের ঘোষণার ৩ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গতভাবে তাদের অধিকার যেন ভোগ করতে পারে।

জাতিসংঘ-ব্যবস্থায় ভাষাভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যেসব বিধান রয়েছে সেইসব সুরক্ষার বিধানগুলো মানবাধিকার কমিটি সুচারুরূপে অনুশলীন করছে কি না তা স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করার ব্যাপার।

ফিলিপাইন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ছিল তখন এক আইনে সেখানকার চীনা ব্যবসায়ীদেরকে হিসেবের খাতা ইংরেজি, স্প্যানিশ বা ফিলিপাইনের কোনো আঞ্চলিক ভাষায় লিখতে বাধ্য করা হয়েছিল। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট Yu Cong Eng v. Trinidad (1926) মামলায় আইনের সমক্ষে সমান আশ্রয়ের নীতির পরিপন্থী বলে ওই আইনকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা দেন।

ওয়েলস ভাষা নিয়ে ইংল্যান্ডে বেশ বাদবিসম্বাদ ছিল। Exparte Jenknis-এর মামলায় Mr. Justice Widgery মন্তব্য করেন যে ওয়েলসের আদালতের কার্যধারা ইংরেজি ভাষাতেই চলবে। পরে ১৯৬৭ সালে ওয়েলস ভাষা আইন পাশ হওয়ার পর ওয়েলস ও মনমাউথশায়ারে ওলেস ভাষার ব্যবহার স্বীকৃত হয়।

কস্তারিকার সংবিধান অনুযায়ী কেউ নাগরিক হতে চাইলে তার স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলা, লেখা ও পড়ার প্রমাণ দিতে হতো। ১৯৮৪ সালে আন্তঃমার্কিন মানবাধিকার আদালত অভিমত প্রকাশ করেন যে, দেশের সরকারি ভাষায় যোগাযোগ করার ক্ষমতার পরীক্ষার ব্যাপারটা অযৌক্তিক, অন্যায্য বা অনুপাতহীনতার দোষে দুষ্ট ছিল না।

ভাষাভিত্তিক সমতা ও অবৈষম্যের প্রশ্ন ১৯৬৯ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার। (ICCPR)-এর ২৬ অনুচ্ছেদ নিয়ে Dominique Guesdon v. France (1990) ও Yves Cadoret Herve and Le Bihan v. France (1991) মামলায় বাকস্বাধীনতা ও ভাষার স্বাধীনতা নিয়ে আলোচিত হলেও সমতা ও অবৈষম্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ফৌজদারি আদালতে একমাত্র ফরাসি ভাষা ব্যবহারের বিধান হেতু ব্রেত-এর অধিবাসীরা তাঁদের মাতৃভাষা ব্যবহার করতে পারতেন না। ফ্রান্সের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়, যেহেতু ফ্রান্সে সকলের জন্য সব আদালতে ফরাসি ভাষার ব্যবহারের বিধান রয়েছে সেহেতু সেই বিধান কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। যে

আসামি ফরাসি ভালো করে বলতে বা বুঝতে পারতেন না তাঁর জন্য দোভাষের ব্যবস্থা ছিল। মানবাধিকার কমিটি ভাষার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য লক্ষ করেননি। আসলে আইনত সমতা থাকলেও বাস্তবে বিধানটি অসম ছিল। আইনি সমতা বাস্তবে অন্যাপ্য ছিল, কারণ ফ্রান্সে যাদের মাতৃভাষা ফরাসি নয়, তাঁদের জন্য তাঁদের মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগ ছিল না।

Ballantyne, Davidson and McIntyre v. Canada (১৯৯৩) ব্যালানটাইন, ডেভিডসন ও ম্যাকইনটায়ার বনাম কানাডার মামলায় বাণিজ্যিক পরিচিতিতে কেবলমাত্র ফরাসি ভাষার ব্যবহারের বিধি ICCPR-এর ১৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বাকস্বাধীনতার লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করা হয়। মানবাধিকার কমিটি বলেন, যেহেতু ফরাসিভাষী ও ইংরেজিভাষী উভয়ের প্রতি এই বিধান সমভাবে প্রযোজ্য সেহেতু তাকে বৈষম্যমূলক বলা যায় না। বলতেই হবে কমিটি বড় সংকীর্ণ অভিমত পোষণ করেন। ২৬ অনুচ্ছেদে সমতা ও অবৈষম্যে যে-বিধান দেওয়া হয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ হয়নি।

মানবাধিকার কমিটির ধারণা পরে পরিবর্তিত হয়। Diergaardt v. Namibia মামলায় যোগাযোগকারীদের নিবেদনে বলা হয় যে, দেশের ভাষার বিধান অনুযায়ী তাঁরা বিচার, শিক্ষা ও জনজীবনে তাঁদের ভাষা আফ্রিকান ব্যবহার করতে না পারায় তাঁরা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। নামিবিয়ার সংসদ ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহারের আইন করতে পারলেও তা করেননি। যোগাযোগকারীদের আরও অভিযোগ ছিল যে, আফ্রিকান ভাষায় লিখিত বা মৌখিক উত্তর না দেওয়ার জন্য সরকারপক্ষ থেকে আমলাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ আফ্রিকান ভাষা জানতেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে সরকারের নির্দেশ সম্পর্কে কোনো সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেনি। কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে, সরকারের নির্দেশ ২৬ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী ছিল।

মানবাধিকার কমিটি এবং ইউরোপ ও আমেরিকার আঞ্চলিক মানবাধিকার অধিকার আদালতগুলোর অভিমত ও রায়ে এখনো বেশ বিভ্রান্তি, বৈপরীত্য ও অভাবনীয়তা বিদ্যমান। মোটামুটিভাবে অবশ্য বলা যায় ভাষার অধিকারের ব্যাপারে সমতা ও বৈষম্যহীনতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

Internation PEN Club-এর Traslations and Linguistic Rights Committee এবং Escarre International Centre for Ethnic Minorities and Nations. ভাষা-অধিকার লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বভার পঞ্চাশজন বিশেষজ্ঞের এক কমিটির ওপর অর্পণ করে। ভাষা-অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাটি ১৯৯৬ সালের ৬ জুন স্পেনের বার্সিলোনা শহরে প্রায় ৯০টি দেশের ২২০জন প্রতিনিধি অনুমোদন করেন।

ঘোষণাটি জাতিসংঘ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় একটি কাউন্সিল অফ ল্যাংগুয়েজেস বা ভাষা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব দেয়। সুপারিশ করা হয় জাতিসংঘের সাধারণ

পরিষদ সেই পরিষদ গঠনে উদ্যোগ নেবে এবং আন্তর্জাতিক আইনে ভাষা সম্প্রদায়গুলোকে সংরক্ষণের জন্য একটা সংস্থা স্থাপন করবে।

ভাষা-অধিকারের ওপর একটি বেসরকারি বিশ্ব উপদেশক কমিশন সংগঠনেরও সুপারিশ করা হয়। ওই কমিশন বেসরকারি সংস্থা এবং ভাষা-আইনের বিষয়ে যেসব সংগঠন কাজ করছে তাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

১৯৯৬ সালে বার্সিলোনা শহরে গৃহীত ভাষার অধিকারের ঘোষণাটি জাতিসংঘ বা ইউনেস্কোর নানান ধরনের বিবেচনায় রয়েছে। ভাষা-অধিকারের ব্যাপারে সমতা ও অবৈষম্য রক্ষা করা এক সুকঠিন ব্যাপার। মানুষের বিরোধ-প্রবণতার জন্য ভাষার ব্যাপারটা শুধু নাজুক নয়, বিস্ফোরকও। ভাষা নিয়ে বিরোধ যে বড় পীড়াদায়ক পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে তার নজির সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে।

আঞ্চলিক বা সংখ্যালঘু ভাষার ইউরোপীয় সনদের এখতিয়ারে ভাষার অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যে-কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন।

উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষা

১

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-৩২৫ সালে সেকান্দার শাহের সিন্ধু উপত্যকা আক্রমণের কাল হতে গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশের লিখিত ইতিহাস শুরু। এই সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছরে আমরা তিনটি পরভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করে এসেছি। এখনও ভাবপ্রকাশে বা বাক্যগঠনে ঠেকে গেলে আমরা সংস্কৃত ও ফারসি এবং ১৮৩৮ সালের পর থেকে ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হই।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আগ্রহে দেশের প্রচলিত আইনের অনুবাদ হয়েছিল বাংলা ভাষায়। ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পরে নতুন করে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব আইন প্রণীত হওয়ার সময় এটা স্থির হয় যে, ফারসি ও বাংলা ভাষায় এসব আইনের অনুবাদ হওয়া দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় অনূদিত আইনবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পায়। বাংলা ১২৫৪ সালের ১৪ চৈত্র তারিখের দৈনিক সংবাদ প্রভাকরের সমপাদকীয়তে লেখা হয়, "বহুদিন হইল ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই রাজ্যের সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন। ... কিন্তু বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহারে অনীহা বিষয়ে আমরা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে যদ্রূপ দোষী করিতে পারি, গবর্নমেন্টকে তদ্রূপ দোষী করিতে পারি না, কারণ তাঁহারা ভিন্ন দেশীয় মানুষ, অধুনা এতদ্দেশের মনুষ্যরা যদি স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা-বিষয়ে মনোযোগী হয়েন, তবে অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারেন, গভর্নমেন্ট তাহাতে কোন প্রকার নিষেধ করেন না, বরং উৎসাহ প্রদান করেন।"

ইংরেজরা যখন বুঝতে পারল যে, এদেশের বাঙালিরা চাকরি ও বাণিজ্যিক কারণে ইংরেজি শিক্ষাকে অপরিহার্য ভাবতে শুরু করেছে, তখন তাদের বাংলা

ভাষার প্রতি ঝোঁক আর থাকল না। আমি *'বাংলায় সংবিধান'*-এ বলি "যাঁদের সঙ্গে জনসংযোগের জন্য বাংলা চর্চা, তাঁরাই ইংরেজি শুধু বলতে ও লিখতেই নয়, এমন কি ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখারও কথা ভাবতে লাগলেন। ফলে নিম্ন আদালতে ফরম, মোহর বা রোজনামচা ইত্যাদি বাংলায় চালু থাকলেও সামগ্রিকভাবে ইংরেজির প্রাধান্য দ্রুত বাড়তে থাকে।"

১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৩৫৭ ধারা-অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজ আদালতে সাক্ষীদের জেরা-জবানবন্দি ইংরেজি ভাষায় অথবা আদালতের ভাষায় লিপিবদ্ধ করার জন্য সরকার নির্দেশ দিতে পারেন। ফৌজদারি কার্যবিধি ৩৬৭ ধারা-অনুসারে ফৌজদারি আদালতের রায় আদালতের ভাষা কী হবে তা ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৫৫৮ ধারামতে সরকার নির্ধারণ করতে পারেন। হাইকোর্টে সাক্ষীদের সাক্ষ্য কীভাবে গৃহীত হবে সে-বিষয়ে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৩৬৫ ধারায় হাইকোর্টকে দেওয়া হয়।

১৯০৮ সালে দেওয়ানি কার্যবিধি ১৩৭ ধারায় বলা হয়, "যে-পর্যন্ত সরকার অন্য নির্দেশ প্রদান না করেন সে-পর্যন্ত হাইকোর্টের অধীনস্থ আদালতে যে ভাষা আদালতের হিসেবে প্রচলিত আছে, সেই আদালতে সেই ভাষাই প্রচলিত থাকবে।"

সিভিল রুলস অ্যান্ড অর্ডারসের ১১ নং বিধিতে উল্লেখ রয়েছে, 'মামলার পক্ষগণ আরজি, বর্ণনা, দরখাস্ত ইত্যাদি এবং অ্যাফিডেভিট ইংরেজি ভাষায় দাখিল করিবেন।' আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন করতে হলে উক্ত আইনসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং প্রয়োজনমতে নতুন আইন, বিধি ও বিজ্ঞপ্তি জারি করা আবশ্যক বলে অনেকে মনে করেন।

২

১৯৪৭ সালের পর যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজিতে আরজি জবাব লিখতেন তাঁরা এদেশে এসে ইংরেজিতে টাইপ করে দ্রুত আরজি দাখিল করতে পারতেন। বাংলায় সেভাবে করা যেত না, যেহেতু তখনো বাংলা টাইপ আবিষ্কৃত হয়নি। তাই যাঁরা বাংলা ব্যবহার করতেন, সময়ের বিচারে তাঁরা তাঁদের মুসাবিদা অত দ্রুত তৈরি করতে পারতেন না। এর ফলে অনেকে আরজি দরখাস্ত ইংরেজিতে লেখা সহজ ভাবেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। অ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ বাংলায় দরখাস্ত লিখে তা হাইকোর্টে দাখিল করতে চাইলে কোর্ট তা গ্রহণ না করায় তিনি বাংলায় একটি রিট পিটিশন করেছিলেন। ওই মামলাটি খারিজ

হলে তিনি তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে আপিলের অনুমতির জন্য দরখাস্ত করলে তাও বাতিল হয়ে যায়। অ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ প্রকাশ্য আদালতে পাকিস্তানি বিচারকদের পরিষ্কার বাংলায় সোজাসুজি বলেন, 'দেশের লোকের ভাষা না জানলে চাকরি ছেড়ে দিন।' দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তেমন প্রশ্ন আর তেমন করে প্রাসঙ্গিক মনে হলো না।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ব্যবহার করার জন্য সংসদ-বিধির এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, "মাননীয় সদস্য প্রস্তাবটা পেশ না করলেই ভালো করতেন। মাননীয় সদস্যের বোঝা উচিত পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্র যে-১০ কোটি মুসলমানের জন্য তৈরি হয়েছে তাদের ভাষা উর্দু।"

প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র অভিহিত করায় দুঃখ করে বলেন যে, 'তা হলে তো দেশের সংবিধান কেবল মুসলমানদের দ্বারাই রচিত হওয়া উচিত।' তিনি বলেন, 'উর্দুতে তাঁর আপত্তি নেই, তবে লোকে তো উর্দু জানে না।'

'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা', পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ২১ মার্চ ১৯৪৮ যে-ঘোষণা দেন তার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'না' বলে। জিন্নাহ্ প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট উসকানিদাতাদের সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে মুসলিমসমাজে সংহতির জন্য আবেদন জানান। তিনি ইন্তেকাল করেন ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮। লিয়াকত আলি খান ১৬ অক্টোবর ১৯৫১ আততায়ীর হাতে নিহত হন। দুজনে কল্পনাও করতে পারেননি ১০ বছরের কম সময়ের মধ্যে উর্দুর সমান শরিক হিসেবে বাংলার দাবি সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করবে।

পাকিস্তানের সংবিধান ১৯৫৬-র ২১৪ অনুচ্ছেদে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বলা হয়, পরবর্তী ২০ বছর অফিসে ইংরেজির ব্যবহার চালু থাকবে এবং তার পরও পার্লামেন্ট আইন পাশ করতে পারবে কী কী উদ্দেশ্যে ইংরেজি ব্যবহার করা যাবে। ১০ বছর পরে প্রেসিডেন্ট ইংরেজি পরিবর্তনের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করবেন। অবশ্য ২০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেও প্রাদেশিক সরকার প্রদেশে ইংরেজির পরিবর্তে যে-কোনো একটি রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিবৃত্ত হবেন না।

৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সংবিধান বাতিল হয়ে যাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে বাংলা প্রচলন করার আর কোনো সুযোগ রইল না। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ আমরা এমনই কোন্দলে ব্যস্ত ছিলাম যে, বাংলা চালু করার কথা তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভিন্তা করিনি।

১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদে উর্দু ও বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে বর্ণিত করা হলেও বলা হয় যে, যত দিন পর্যন্ত ইংরেজি সরানোর ব্যাপারে ব্যবস্থা না নেওয়া হচ্ছে, ততদিন অফিসের কাজে ও অন্য উদ্দেশ্যে অপর কোনো ভাষা ব্যবহার, বিশেষ করে ইংরেজির ব্যবহার, ব্যাহত হবে না এবং সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি সারানোর ব্যাপারটা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট একটা কমিশন নিয়োগ করবেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "আমি ঘোষণা করছি আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতরা পরিভাষা তৈরি করবেন তার পরে বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদরা যত খুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।" যা আছে তা-ই নিয়ে বাংলা ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একটা ডাক এই বক্তব্যের মধ্যে ছিল।

১০ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুরে বৈদ্যনাথতলায় (বর্তমান মুজিবনগরে) ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এক গণপরিষদের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নির্বাসনে অস্থায়ী সরকারের অনেক কাজ বাংলায় করা হলেও আইনের ক্ষেত্রে ও বিদেশী চিঠিপত্র আদান-প্রদানে ইংরেজি-ব্যবহার অব্যাহত থাকে। শপথ অনুষ্ঠান, বেসামরিক ও সামরিক অনুষ্ঠান বাংলায় শুরু হয়। মুক্তিবাহিনীতে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেনাবাহিনীতে বাংলা প্রচলনের কাজ বেশ বাস্তবায়ন লাভ করে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ প্রবাসী সরকার দেশে প্রত্যাবর্তন করে। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১ নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা দেন, 'বাংলা হবে দেশের সরকারি ভাষা।' তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলার প্রচলন সম্ভব হয়নি। যুদ্ধোত্তর জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে দেশে প্রেসিডেন্টের শতাধিক আদেশ ইংরেজিতেই জারি করা হয়।

সংবিধানের প্রথম ভাগে যেখানে দেশের নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে, সেখানে ৩ অনুচ্ছেদে বর্তমানকালবাচক বাক্যে বিধান দেওয়া হয়, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ওই বিধানের ভর বা ব্যাপ্তি কী? দেশে প্রচলিত যেসব আইনবিধির বদৌলতে ইংরেজির ব্যবহার এখনো অক্ষুণ্ন সেগুলো ৩ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রভাবান্বিত, পরিবর্তিত বা পরোক্ষভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে, না হয়নি? সেসব প্রশ্নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য দেশের সর্বশেষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে কোনো নিবেদন করা হয়নি।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণদান করে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক আদেশে বলেন, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, স্বাধীনতার তিন বছর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি যে তার ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালি কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলা চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এ আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধাসরকারি অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এ বিষয়ে কোনো অনাথা হলে উক্ত বিধি লঙ্ঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্তাব্যক্তিগণ সতর্কতার সঙ্গে এ আদেশ কার্যকরী করবেন এবং আদেশ লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি-বিধান ব্যবস্থা করবেন।"

৩

সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিগত বিলের প্রস্তাবের ওপর ১৯৮৭ সালের ২ নং আইন পাশ করা হয়। এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটা আইন সরকারের উদ্যোগে না হয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাশ করা হলো কেন? আমরা প্রস্তাবক না সরকার, কাকে ধন্যবাদ জানাব?

১৯৮৭ সালের ২ নং আইনের ৩ ধারায় বলা হয় :

৩। প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন-আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলি অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে।

(২) ৩ (১) উপ-ধারায় উল্লিখিত কোন কর্মস্থলে যদি কোন ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন, তাহা হইলে তা বেআইনি ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন, তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

প্রচলিত আইনে ইংরেজি ব্যবহারের যেসব বিধান রয়েছে, তা ১৯৮৭ সালের আইনে পরিষ্কারভাবে বা পরোক্ষভাবে বাতিল করে দেয়নি এবং সরকারও

দেওয়ানি কার্যধারা আইন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক কোনো ঘোষণা দেয়নি এবং ওই আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী সরকার কোনো বিধিও প্রণয়ন করেনি।

এমতাবস্থায় উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অফিসের সকল কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাইতেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭-এর পরিপন্থী কোন কাজ করা হইলে উক্ত আইনের ধারা ৩(৩) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী শৃঙ্খলা আপিল ও বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ওই আইন প্রচলনের পরও নিম্ন আদালতে কিছু মামলায় বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে আরজি দাখিল করা হয়। দেওয়ানি কার্যবিধির ৭ নং আদেশের ১১ নং নিয়ম অনুসারে আরজি বাংলা ভাষা প্রচলন আইন অনুসারে বাংলায় না হয়ে ইংরেজিতে লেখা হওয়ায় ওইসব মামলার বিবাদীপক্ষ আরজি খারিজ করার জন্য আবেদন করেন। নিম্ন আদালত ওইসব দরখাস্ত শুনানির পর তা বাতিল করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ওই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন মামলা করেন। ওইসব রিভিশন মামলার শুনানির পর বিচারপতি আমীর-উল ইসলাম চৌধুরী এবং মাহমুদুর রহমান ১৯৯১ সালের ২৮ নভেম্বর হাশমাতুল্লাহ বনাম আজমিরি বিবি মামলায় তাঁদের রায়ে [44 DLR 332] নিম্ন আদালতে বাংলার সঙ্গে ইংরেজিতেও আরজি জবাব দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিল করা বৈধ বলে ঘোষণা দেন।

১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে 'অন্য আইনে যাহাই কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর হইবে' বাক্যটি না থাকায় অনেকে মনে করেন আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি। হাইকোর্ট যে রায় দেন যে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিও চলবে সেই রায়ে বলা হয় :"The Constitution of Bangladesh has not prohibited the use of English language but has approved of its use in some respect. The term 'Court Language' means the language to be used for the purpose of the business of the Court. The Act (Bangla Bhasha Prochalan Ain) has been enacted under Article 3 of the Constitution which provides for making Bengali as state language. The term 'Court Language' being narrower, would exclude the application of the term 'State Language' for the purpose of the language to be used in the subordinate Court."

উক্ত রায় সম্পর্কে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালে *সমকালে* প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক বলেন, 'হাশমতউল্লাহ বনাম আজমিরি বেগমের মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ বাংলা ভাষা প্রচলন আইনকে সংবিধানের পরিপন্থী বা বেআইনি ঘোষণা না করলেও অধস্তন দেওয়ানি আদালতে ইংরেজি

ভাষা ব্যবহার আইনসম্মত বলে ঘোষণা করেছেন। দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারার ওপর ভর করে এই মামলায় যে রায় দুই বিচারক দিলেন যে, বাংলার সঙ্গে ইংরেজি চলবে, সেটাও এই একই মামলাতেই খারিজ হয়ে যায়। কেননা, একই বিষয়ে যদি পূর্ববর্তী আইনের সঙ্গে পরবর্তী আইনের বিরোধ দেখা দেয়, তা হলে পূর্ববর্তী আইন বাতিল বলে গণ্য হয়। কিন্তু ওই রায়ের সময় আইনজীবীদের কেউ বিচারকদের এই যুক্তি দিতে ব্যর্থ হন।'

উক্ত রায় নিষ্ক্রিয় বা পরিবর্তিত করার জন্য আপিল বিভাগে রণক্লান্ত ভাষাসৈনিকরা কোনো আপিল দায়ের করেননি। এ-পর্যন্ত কোনো সংসদীয় পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় সকল অধস্তন আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয়।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ও আপিল বিভাগে ইংরেজিতে যে-রায় লেখা হয় তা কি সংবিধান বা আইনবিরুদ্ধ হচ্ছে? হাইকোর্ট ডিভিশনের যে-বিচারকগণ একাধিক রায় যে বাংলায় লিখলেন সেগুলো কি আইনসম্মত? আমাদের বিচারকগণ বলতে কি বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্য মাঝেমধ্যে বাংলা ভাষায় আরজি-জওয়াব গ্রহণ করেন এবং কোনো উচ্চবাচ্য না করে আইনজীবীদের বাংলায় প্রদত্ত নিবেদনও শোনেন।

সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ম প বি-৯/৫/৯০ বিধি/৩৩৬ তাং ২২শে আগস্ট ১৯৯০-এর স্মারকসংবলিত পত্রে বলা হয় : 'বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে প্রচলনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে সরকার বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ জারি করেছেন। উক্ত আইনের ৩ ধারা মোতাবেক সকল সরকারি অফিস, আদালত, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সহিত যোগাযোগ ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নথি, চিঠিপত্র, আইন-আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগ কার্যাবলি অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে। এমন যদি উপরোল্লিখিত কোন কর্মস্থলে কোন ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন, তাহা হইলে উহা বেআইনি ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা সত্ত্বেও সরকার দুঃখের সহিত লক্ষ করিতেছেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হইতেছে।'

১৯৯৮ সালের পহেলা মার্চ ঢাকায় বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের পবিত্র সংবিধানে আছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ আর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সকল আদালতই এই প্রজাতন্ত্রের আদালত। ... সম্মানিত বিচারকগণ বাঙালি, বিজ্ঞ আইনজীবীগণ বাঙালি এবং বিচারপ্রার্থীগণও ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সবাই বাঙালি। সকল আদলত কর্তৃক ঘোষিত রায় বাংলা

ভাষায় হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এই বিচারব্যবস্থা নয়। এই বিচারব্যবস্থা দেশের সকল মানুষের। সর্বস্তরের আদালতের সম্মানিত বিচারকগণ নিজের মাতৃভাষায় যেন নিপুণভাবে রায় লিখতে পারেন, এই বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এই ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবে বলে জনগণ আশা করে।"

৪

২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষার ব্যবহার নিয়ে সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য মজলিশে বেশ আলোচনা হয়েছে। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ দৈনিক ইত্তেফাকে জেলা ও দায়রা জজ চৌধুরী মুনীর উদ্দীন আহমদের 'উচ্চ আদালতে শুধুই বাংলা ব্যবহার : আবার কি শহীদ হতে হবে?'-শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, 'কোনো আন্দোলন যখন লোকাচারে পরিণত হয় তখন নাকি সে আন্দোলনের মৃত্যু ঘটে। আমাদের ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেন এমনটি না হয়। ... '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত ৫৪ বছর গড়িয়ে গেল। স্বাধীনতার পর থেকে ৩৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তথাপি সুপ্রিম কোর্টসহ বাংলাদেশের অনেক আদালতে আজও আদালতের একমাত্র ভাষা হিসেবে বাংলা পুরোপুরি চালু হয়নি। ... যাঁরা বাংলায় রায় লিখেন তাঁদের নমশূদ্রসম ও যাঁরা ইংরেজিতে রায় লিখেন তাঁদের ব্রাহ্মণসম মর্যাদা দেওয়া হয়। কর্মরত অধস্তন আদালতের বিচারকদের থেকে বিচারপতি নিয়োগের বেলায় বাংলায় ভালো রায়ের লেখককে প্রাধান্য না দিয়ে বরং ইহা তার অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। অপরদিকে ইংরেজিতে রায় লেখককে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এ কথা অপ্রিয় হলেও সত্য। ... বার কাউন্সিলের সনদ পাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণবিষয়ক সনদ ইংরেজিতে দেওয়া হয় এবং ওই সনদ অনুষ্ঠানে বার কাউন্সিলের সদস্যসহ উপস্থিত অন্য অতিথিরা বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষীদের সম্মুখে (অকারণে কোনো সন্তান কর্তৃক তার মায়ের সামনে মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষায় কথা বলার মতোই শ্রুতিকটু ও বিরক্তিকর) অহেতুকভাবে ইংরেজি ভাষায় অনুষ্ঠান পরিচালনাসহ সকল বক্তব্য ইংরেজিতেই দেওয়া হয়।' জনাব আহমদ প্রশ্ন করেন, 'সকল আদালতে (ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত) একমাত্র বাংলা ভাষায় সকল কাজ করার জন্য কি নতুন কোনো আন্দোলন করতে হবে? আবার মিছিল? আবার স্লোগান? আবার রক্ত দিতে হবে? শহীদ হতে হবে আবারও?

১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ জাতীয় প্রেসক্লাবে সর্বোচ্চ আদালতে ভাষানীতি বিষয়ে এক গোলটেবির বৈঠক বসেছিল। বৈঠকের সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছিলেন, 'সর্বোচ্চ আদালতের বর্তমান ভাষানীতি বিবেচনায় নিলে বলতে হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্থক হয়নি।' সেই বৈঠকে অধ্যাপক

সলিমুল্লাহ খান প্রশ্ন উত্থাপন করেন, 'দেশের সর্বত্র আদালতে বাস্তবে অনুসৃত বর্তমান ভাষানীতি কি প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? যদি না হয় তবে তার প্রতিকার কী?'

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তাফা কামাল তাঁর ২০০৬ সালের অমর একুশে বক্তৃতায় বলেন, 'আমরা প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি এলেই শোকবিহ্বল হয়ে পড়ি, আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই, কিন্তু আমাদের জ্ঞাতসারেই বাংলা চালু না হয়ে যে ইংরেজির প্রসার ঘটছে, তার কারণও আবেগবর্জিত মস্তিষ্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করছি না এবং বাস্তবতা ও ভাষা জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণে ভাষানীতির একটি সাহসী সিদ্ধান্তও নিতে পারছি না। আমাদের এই অক্ষমতার মাশুল আমরা ইতিমধ্যেই গুনতে শুরু করেছি। আমাদের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মদান শুধু ভাষাস্তুতিতেই সার্থক হবে না, হবে নিরন্তর পর্যালোচনা সময়ের সঙ্গে ভাষানীতির ক্রমিক বিবর্তন, নিরলস পরিশ্রম ও অকৃপণ আত্মসমালোচনার ভেতর দিয়েই।' তিনি উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে কিছু বলেননি।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সমকালে প্রকাশিত বক্তব্যে বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী বলেন, 'যে রায়গুলো হচ্ছে বিদেশে, সেগুলোর অনুবাদ হবে। একটা অনুবাদ কেন্দ্র থাকা দরকার। কিন্তু সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এটা তো বিচারপতিদের, আইনজীবীর ত্রুটি নয়। এটা তো রাষ্ট্রের ত্রুটি। ... রাষ্ট্রের অমনোযোগিতার দায় হাইকোর্টের বিচারপতি এবং আইনজীবীদের ওপর চাপালে তো হবে না। এলএলবি ক্লাসে বাংলা অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান করুন। তা না হলে আইনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। ... আগের যে রায়গুলো ইংরেজিতে হয়েছে, সেগুলোও অনুবাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।' রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করার ব্যাপারে তিনি মনে করেন, 'রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং রাষ্ট্র উদ্যোগী না হলে সুশীল সমাজকে আন্দোলন করতে হবে।'

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক জনাব এম ইনায়েতুর রহিম বলেন, 'যদি ১৯৫৬ থেকেই বাংলা অন্যতম এবং ১৯৭১-এর পর থেকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তবুও এটা দুঃখজনক যে, আজো এ বিষয়ে আমাদের বিতর্ক করে যেতে হচ্ছে। ... আমি মনে করি, উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে না শুধু আমাদের মানসিকতার কারণে এবং এ মানসিকতার পেছনে দায়ি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সরকারের চরিত্রের বিষয়গুলো বলা হয়েছে।

'আজ উচ্চ আদালতের রায়ে একটি লোকের ফাঁসির আদেশ যখন বহাল থাকে, সে লোকটি কিন্তু জানতে পারছেন না যে, জজ সাহেব কী কী কারণে তাঁর ফাঁসির আদেশ বহাল রেখেছেন। আবার যখন কোনো আসামি খালাস পেয়ে

যাচ্ছেন তখন ফরিয়াদিও জানতে পারছেন না কী কী কারণে তিনি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে তার স্বামী, ভাই, ছেলে বা বাবাকে মেরেছে, কী কারণে আদালত তাকে খালাস দিয়ে দিচ্ছে।

'হাইকোর্টের অধিকাংশ বিচারপতি মনস্তাত্ত্বিক বাধার কারণে আদালতে বাংলা প্রচলনের বিষয়টি ভালোভাবে নেন না।'

২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সাল সমকালের নিকট বিচারপতি কাজী এবাদুল হক বলেন যে, '১৮৩৭ সাল থেকে ফার্সি ভাষার পরিবর্তে কোর্টকাচারিতে দেশী ভাষা অর্থাৎ বাংলাদেশে বাংলা চালু করা হয়। তখন নিম্ন আদালতে বাংলা ও ইংরেজি এবং উচ্চ আদালতে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারায় ইংরেজির সঙ্গে দেওয়ানি আদালতে দেশী ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছিল। আর ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারায় অধস্তন ফৌজদারি আদালতে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সরকারকে। ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশে অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে বেশির ভাগ কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতো। ১৯৪৭ সালে ঢাকা মফস্বল শহর থেকে প্রাদেশিক রাজধানীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর ঢাকা নগরীর অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে ও অন্যান্য বড় শহরের অধস্তন দেওয়ানি আদালতে বাংলার চেয়ে ইংরেজির ব্যবহার বেড়ে যেতে থাকে।'

বিচারপতি কাজী এবাদুল হকের মতে বাংলা প্রচলন আইনে প্রবর্তিত হওয়ার পরে বাংলা ভাষা সরকারি কার্যালয় এবং আদালতে অনুসরণ না করার বাহানার কোনো কারণ নেই। তিনি বলেন : 'উচ্চ আদালতের বিধি অনুসারে সকল কাজকর্ম ইংরেজিতে হওয়ার কথা। কিন্তু সেই বিধি পাকিস্তান আমলের এবং সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদে আছে 'প্রজাতন্ত্রের ভাষা হইবে বাংলা।' এটা সর্বোচ্চ আইন। এটা সংবিধানের মৌলিক নীতি। অনেকে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের কার্যবিধি সুপ্রিম কোর্ট ঠিক করবে এটা সংবিধানে ঠিক করে দেওয়া আছে। তা ঠিক, কিন্তু সর্বোচ্চ আইনের বিধানের বরখেলাপ করা যেতে পারে না। সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদে আছে সংবিধান সর্বোচ্চ আইন। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাংলা ভাষা আইন প্রণীত হয়েছে। সুতরাং ওই যুক্তি কার্যকর নয়। বিচারপতি কাজী এবাদুল হক বলেন, স্বাধীনতার পর গাজীউল হক উচ্চ আদালতে বাংলায় দরখাস্ত ও আপিল দাখিল এবং সওয়াল জবাব করতে থাকেন। যদিও প্রথম দিকে বিচারকগণ তাঁকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁর সেই প্রচেষ্টা ব্যাহত করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা বেশি বিস্তৃত হয়নি অন্য আইনজীবীদের সহযোগিতার অভাবে। আদালতের কাগজপত্র আইনজীবীরা ইংরেজিতে করতে বেশি উৎসাহ বোধ করেন, কারণ ইংরেজিতে একটা কাঠামো তৈরি আছে। চিরকাল সেভাবেই হয়ে আসছে, তা তাঁরা বদলাতে চান না। কারণ

তাতে পরিশ্রম বাড়ে। সব জিনিসের গোড়ায় একটা সদিচ্ছা চাই। এখানে সেটা দেখা যাচ্ছে না।'

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক আরো বলেন, 'আবার বাংলা প্রচলনের অর্থ এই নয় যে, ইংরেজি উঠে যাবে, যেহেতু বেশির ভাগ বইপত্রই ইংরেজিতে লেখা। কিন্তু বাংলায় চর্চার জন্য তো কোনো অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। বাংলা জ্ঞান তো সবারই আছে। কথা হচ্ছে, তিনি তা চর্চা করতে রাজি কি না? 'ল' কলেজে তো সবাই বাংলাই পড়ে। তবে পরে বাংলা ব্যবহার বাদ দেয় কেন। করতে না চাইলে অনেক বাহানা আছে। কিন্তু করতে হলে সদিচ্ছা চাই। এখন আর ব্রিটিশ রীতির অন্ধ অনুকরণ করার কোনো মানে নেই। সেই আইন এখন সংবিধান ও বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।'

উচ্চ আদালতে বাংলা প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধা নেই। আইন আছে, তার প্রয়োগের জন্য অনেক আলোচনা ও বিতর্কের থেকে বেশি প্রয়োজন একটি মামলা যে, কেন আদালতে ইংরেজি চলবে। এভাবে রায় আদায় করে নিলেই বাধা যা আছে তা দূর হয়। এখন প্রচলনের ক্ষেত্রে যে-দুটি বাধা দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারা এবং হাইকোর্ট রুলসে আছে, যে-কেউই এ-সম্পর্কে উচ্চ আদালতে মামলা করে রায় নিতে পারেন। বিচারপতি আমীর-উল ইসলাম চৌধুরী ইংরেজি চালু থাকবে বলে উক্ত মামলায় যে-রায় দিলেন, তার পূর্বে তিনিই কতিপয় মামলার রায় বাংলা ভাষায় লিখে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তী সময় বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, আবদুল কুদ্দুস, হামিদুল হক, ফজলুল করিম প্রমুখ বিচারক বাংলা রায় প্রদান করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, উচ্চ আদালতের বিচারকার্য এবং রায়প্রদান বাংলা ভাষায় করায় কোনো অসুবিধা নেই।

ইংরেজির সঙ্গে বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আইনসহ সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ায় এবং বেশির ভাগ আইনজীবীর ইংরেজিজ্ঞান সীমিত হওয়ায় সকল আদালতের কাজকর্ম বেশিদিন ইংরেজিতে রাখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে বাংলার ব্যবহার বাড়তে বাধ্য। কিন্তু বাংলায় আইনের বইয়ের অভাবই সবচেয়ে বড় বাধা। এর জন্য উদ্যোগ দরকার। দরকার বাংলায় আইন বই রচনা ও অনুবাদ করা। নইলে অচিরে এমন এক অবস্থা হবে যে, ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের ফলে মামলা নিষ্পত্তির হার কমে যাবে। সে-লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নিয়মাবলি সংশোধন করে বাংলায় আপিল, দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিল করার বাধা দূর করা দরকার।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত 'উচ্চ আদালত থেকে বাংলা ভাষার নির্বাসন' শীর্ষক প্রবন্ধে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ এবং বিজয় বাংলা কিবোর্ড এবং সফটওয়্যারের জনক মোস্তফা জব্বার বলেন, 'যদিও বিচারপ্রার্থীদের (বাদী-

বিবাদী) শতকরা একশ ভাগ, বিচারকদের শতকরা একশ ভাগ, উকিলদের শতকরা একশ ভাগ, দেশীয় আইনের শতকরা একশ ভাগ এবং বিচারালয়ের কর্মচারীদের শতকরা একশ ভাগই বাংলাভাষাভাষী, তবুও এই আদালতে বাংলা ভাষার প্রবেশাধিকার নেই।'

আমার কথা উল্লেখ করে এক সহৃদয় অনুযোগে জনাব জব্বার বলেন, 'বিচারপতি হাবিবুর রহমান বাংলা ভাষার প্রতি অতি দরদি একজন মানুষ। তাঁর লেখায় এর প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু তিনিও যখন বিচারক ছিলেন তখন কিন্তু উচ্চ আদালতে বাংলা প্রচলনের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি তিনি যখন সরকারপ্রধান ছিলেন তখনো এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তিনি যে বলছেন 'যে সংসদকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে' তার অর্থ সংসদকে আবার একটি আইন পাস করতে বলা। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বাংলা ভাষা প্রয়োগ করার জন্য আইন তো আছেই। সেই আইনের আওতাতেই কিন্তু উচ্চ আদালতসহ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা প্রয়োগ করা সম্ভব।' জনাব জব্বার আরো বলেন, 'বাংলা ভাষার প্রতি উচ্চ আদালতের সঙ্গে যুক্ত অনেকেরই সমর্থন নেই। অতীতেও ছিল না। আজ হয়তো অনেকেই স্মরণ করেন না, পরলোকগত বিজ্ঞ আইনজীবী সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদের নেতৃত্বে একদল আইনজ্ঞ (সংখ্যায় ১০০-এর ওপর) এই বাংলা প্রচলন আইনটি সমর্থন করেননি। অন্যদিকে ১১০০-এরও বেশি আইনজীবী আইনটির সমর্থনে পত্রিকায় বক্তব্য প্রচার করেছিলেন। আসলে প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, উচ্চ আদালতের সবচেয়ে জ্ঞানী বলে আমরা যাঁদের জানি তাঁরা হয়তো বাংলা ভাষাকে তাদের পেশার ভাষার স্থানটি দিতে চান না।'

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ *সমকালে* প্রকাশিত এক বক্তব্যে ভাষা-সৈনিক আবদুল মতীন বলেন, 'আজ একটা মহল চেষ্টা করছে, বাংলা না থাকলে তারা এ রাষ্ট্রটিকে ভেঙে ফেলতে পারে। ভাষাই তো জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এ ভয়েই তারা অন্য জায়গায় চলে যেতে চায়।' তাঁর মতে, 'যত যাই হোক রাষ্ট্রের সব কাজে রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করতে হবে।'

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ *সমকালে* প্রকাশিত এক বক্তব্যে সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এবং বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান রোকনউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'সংবিধানের কোথাও বলা হয়নি সব ধরনের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বাংলায় করতে হবে। ইংরেজি ব্যবহার সংবিধান পরিপন্থী হবে না। সংবিধান ইংরেজিকে বাদ দেয়নি বরং ইংরেজি টেক্সটের বিধান করে দিয়ে ইংরেজিকে গ্রহণ করেছে, ইংরেজিকে একটি ভাষার মাধ্যম হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। ... সংবিধান রাষ্ট্রভাষা বলেছে বাংলাকে। অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে না এ কথাটি বলেনি।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের জাতীয় স্বার্থে এবং প্রয়োজনেই ইংরেজি শিখতে হবে। কারণ বাংলাদেশের কোনো বিষয় নিয়ে যদি আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে হয় কিংবা মামলা ওঠে, তা ইংরেজিতেই মোকাবিলা করতে হবে। কোনোভাবেই তা বাংলায় মোকাবিলা করতে পারব না। আমরা যদি এগিয়ে যেতে চাই তা হলে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের ভাষা বাংলা হওয়ার দাবি জানিয়ে নতুন ইস্যু তৈরি করা সমীচীন হবে না। সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টকেই তার পদ্ধতিগত ব্যাপারে ভাষাসহ সকল বিষয়ে আইন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়েছে এবং ইংরেজিতে সেভাবেই চলছে।'

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সমকালে প্রকাশিত এক বক্তব্যে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমি মোটেই মনে করি না বাংলাদেশের উচ্চ আদালতসহ প্রজাতন্ত্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকৃত আইনি প্রতিবন্ধকতা আছে বা থাকতে পারে।'

তাঁর মতে সুপ্রিম কোর্টের ৩৫০০ জন রেকর্ডভুক্ত আইনজীবীর সর্ববৃহৎ অংশ ইংরেজিতে মোটেই সিদ্ধহস্ত নন। আইনজীবীদের মধ্যে তিন শ্রেণীর ইংরেজি চর্চার অনুসারী দেখা যায়। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ প্রবীণরা বাধ্যতামূলক ইংরেজি শিক্ষায় অভ্যস্ত এবং সিদ্ধহস্ত। তাঁদের সংখ্যা দুই-আড়াইশো জনের অধিক নয় এবং তাঁদের প্রায় অর্ধাংশ বর্তমানে নিয়মিত আদালতে আসেন না এবং মামলা-মোকাদ্দমা পরিচালনা করেন না।

জনাব নজরুল ইসলাম বলেন, "আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা উচ্চ আদালতসহ প্রজাতন্ত্রের সর্বস্তরে অদ্যাপি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ার পেছনে যে শক্তিটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে তারা হলেন আমাদের সমাজের, রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠিত একশ্রেণীর 'শিক্ষিত মূর্খ', 'ভেক দেশপ্রেমিক', বিলাসবৈভবপ্রিয় অর্থলোভী ও আত্মপ্রতিষ্ঠালোভী, আত্মকেন্দ্রিক, নিষ্ঠুর ও কপট ব্যক্তিবর্গ। তারা 'মু মে শেখ ফরিদ, বগলমে ইট' সদৃশ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত অঙ্গনে 'রাষ্ট্রভাষা' বাংলাকে পাশ কাটিয়ে 'অ-রাষ্ট্রভাষা' ইংরেজির প্রতি নির্লজ্জ পক্ষপাত প্রদর্শন করে চলেছেন।"

জাতীয় ভাষানীতি সম্পর্কে *সমকাল* বিতর্কে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যে বিচারপতি কে এম সোবহান বলেন, "নিম্ন আদালতে বাংলাভাষা বাধ্যতামূলকভাবে চালু রাখতে হবে। কারণ নিম্ন আদলতে যারা বিচারপ্রার্থী হয়ে আসে, সাক্ষী হয়ে আসে তাদের অনেকেই মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, অর্ধশিক্ষিত, সামান্য শিক্ষিত। সে কারণে নিম্ন আদালতের ভাষা অবশ্যই বাংলা হওয়া উচিত।

তা না হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তবে এ প্রসঙ্গে উচ্চ আদালতের ভাষা কী হওয়া উচিত সে কথাও আসবে। সুপ্রিম কোর্টের দুটি বিভাগে হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগে ইংরেজি ভাষা চালু রাখতে হবে, রাখা উচিত। তার প্রধান এবং একমাত্র কারণ হচ্ছে বাংলায় ভাষান্তরিত করার কোনো প্রতিশব্দ ইংরেজি ভাষায় কম হয়নি। যত দিন না এটা হবে ততদিন বাংলার অঙ্গহানি হবে এবং এ কারণে আমি মনে করি উচ্চ আদালতে আমাদের অনেক সাংসদ, মন্ত্রীর মতো খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। যেহেতু অনেক ইংরেজি শব্দের জুতসই সঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় প্রায় নেই সেহেতু উচ্চআদালতে জাজমেন্ট আর্গুমেন্ট ইংরেজিতেই হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যেকোনো দেশেরই উচ্চ আদালতের রায় বিদেশে পঠিত হয়। বিশেষ করে কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর একটি 'ল' জার্নাল আছে, যেটি নিয়মিত বের হয়। এখানে কমনওয়েলথ দেশগুলোর উল্লেখযোগ্য বা মাইলফলক রায় দেওয়া হয়, যে রায়গুলো এই কমনওয়েলথ 'ল' জার্নালে ছাপা হয় এবং বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের অনেক রায়ও কমনওয়েলথ 'ল' জার্নালে ছাপা হয়েছে। অন্য দেশে তা পঠিত হয়েছে এবং সে রায়গুলো প্রশংসিতও হয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের রায় অন্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং রেফারেন্স হলে সেটা দেশের ভাব মর্যাদাই বৃদ্ধি করে কিন্তু সেই রায়গুলো ইংরেজিতে দেওয়া হয়েছে বলেই তা প্রশংসতি হয়েছে, কমনওয়েলথ 'ল' জার্নালে ছাপা হয়েছে বা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলায় রায় লেখা হলে এটা হতো না এবং দৃষ্টি আকর্ষণ বা রেফারেন্স হতো না।"

তিনি বলেন, 'বাংলায় যে রায় দেওয়া হয় কিংবা হচ্ছে বা হবে সে রায় দেশের বাইরে আরো কোথাও পঠিত বা আলোচিত হবে না। এটা নিশ্চিত।' তাঁর কথা, 'উচ্চ আদালতের বিচারক, আইনজীবীরা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় এবং সঙ্গত কারণে ... বিশ্বের অনেক দেশ থেকেই, অনেক ইংরেজি জার্নাল থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, যেখানে রায়টা হয়েছে ইংরেজিতেই এবং তার টেক্সট বইটিও ইংরেজি। ... ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে উদ্ধৃতি দিতে গেলে তার অঙ্গহানি হবে। সবচেয়ে বড় কথা, অত সময় কোথায়। বাংলায় অনুবাদ করার মতো যুৎসই প্রতিশব্দ কোথায়, থাকলেও ক'জন তা ঘাঁটবেন। আর কতটারইবা অনুবাদ করে করে পড়বেন? কাজেই উচ্চ আদালতে ইংরেজি প্রচলন জারি থাকা বাঞ্ছনীয়।'

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সমকালে প্রকাশিত প্রবন্ধে সলিমুল্লাহ খান বলেন, "বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা—এই সত্য যারা মেনে নিতে পারেননি তাঁরাই সর্বশেষ ঘাঁটি গড়েছেন সর্বোচ্চ আদালতের আশপাশে, মহান গরিমা আর উচ্চ মর্যাদার ছায়াতলে। আড়ালে-আবডালে। সে কারণে হয়তো এবার 'উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রবর্তন' একুশে ফেব্রুয়ারির প্রধান ইস্যু। জাতীয় ভাষার

বিরোধীরা উচ্চশ্রেণীর মানুষ। কিছু নিম্নশ্রেণীর সন্তানও হয়তো বুঝে না বুঝে উচ্চশ্রেণীর পথ ধরছেন। তাঁরা জানেন না রাষ্ট্র সমাজের সব স্তরে জাতীয় ভাষার ব্যবহার ছাড়া গণতন্ত্রের ন্যূনতম শর্ত পূর্ণ করা যায় না। তাই গণতন্ত্র চাইলে তো উচ্চ বা নিম্ন সব শ্রেণীর মানুষই জাতীয় ভাষার সংগ্রামে শামিল হতে পারেন। এখনই সে সময়। উচ্চ আদালতে বাংলা চালু হলেই দেশে গণতন্ত্রের বিস্তার হু হু করে বয়ে যাবে এ কথা বলি না। তবে উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা চালু না হলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না। সব আদালতে সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা চালু করা রাজনীতির পরিভাষায় 'জাতীয় গণতান্ত্রিক' বিপ্লবের অঙ্গ ও পূর্বশর্ত। এ শর্ত পরিহার করা যায় না। ... প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা গ্রহণ করার অধিকার জাতীয় সংসদের নেই সংবিধানের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদ তার বিধান করেছে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকার, সংবিধানের উপরওয়ালা নয়। সংসদীয় প্রথায় জাতীয় সংসদই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অঙ্গ। সংসদ-প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার বা প্রয়োজনে সে আইন বাতিল ঘোষণার ক্ষমতা আছে সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার গোড়া দেশের সংবিধান। তাই সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান লঙ্ঘন করতে পারেন না। করার ফল অভাবনীয়। পায়ের নিচে মাটি বলে একটা কথা আছে না।"

তিনি আরো বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের ভাষা বাংলা হওয়ার দাবি' নাকি 'নতুন ইস্যু তৈরি' করা? আমাদের শহীদ ছাত্র-বুদ্ধিজীবীরা বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। তাঁরা কি বলেছিলেন উচ্চ আদালতে বাংলা চাই না? উজির উকিল বলছেন, বাংলা আমার জাতিত্বের অহঙ্কার ও অলংকার। ... বাংলা আমাদের অলংকার নহে, বাংলা আমাদের 'খাদ্যবস্তু' আর খাদ্যপ্রাণ। শিক্ষার সর্বস্তরে আর উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের দাবি কত পুরনো তা জানতে দরকার অহঙ্কার নয়, সামান্য বিনয়।' সলিমুল্লাহ খান বলেন, 'রাষ্ট্রভাষার বিধান নিরঙ্কুশ অর্থাৎ 'তবে অন্যান্য ভাষাও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে চালন করা যাইবে'–গোছের কোনো কথা সংবিধান কোথাও লেখেননি। এক প্রতিনিধি দাবি করছেন, সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলেছে বাংলাকে। অন্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, এ কথাটি বলেনি। (মাহমুদ ২০০৬) সংবিধান কী বলেনি তার কোনো শেষ নেই। বিচারের মাপকাঠি সংবিধান কী বলেনি, তা দিয়ে হয় না, কী বলেছে তাতে কোনো অস্পষ্টতা থাকলেই শুধু ওই কথা পাড়া যেত।'

'বাংলাদেশের কোথাও কার্যপ্রণালী সুপ্রিম কোর্ট নিজেই ঠিক করবে এবং 'সুপ্রিম কোর্টে ইংরেজি চললে আইন ও সংবিধানের বরখেলাপ হয় না।' রোকনউদ্দিন মাহমুদের এই বক্তব্যের ওপর সলিমুল্লাহ খান মন্তব্য করেন আসল প্রশ্ন—'সুপ্রিম কোর্টে বাংলা না চললে' আইন ও সংবিধানের বরখেলাপ হয় কি না—মাহমুদ কৌশলে এড়িয়েছেন। তার দাবি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ দাবির ভিত্তি সংবিধানের ১০৭ (১) অনুচ্ছেদ। ওই অনুচ্ছেদ বলছে, 'সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে

কোনো আইন-সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোনো আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।' ... স্পষ্টতই সেই 'বিধিসমূহ' সংবিধানের মূলনীতি কিংবা বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না। এ কারণেই সুপ্রিম কোর্টে ইংরেজির অব্যাহত ব্যবহার সংবিধানের লঙ্ঘন। দেওয়ানি আর ফৌজদারি কার্যবিধির কথা আলাদাভাবে তোলা নিছক কুযুক্তির উদাহরণ বাড়ানো। সংবিধানের বিধানের সঙ্গে অসমঞ্জস সব প্রচলিত আইন যতটুকু অসমঞ্জস ততটুকু বাতিল। 'নজিরি আইন'ও প্রচলিত আইনের সংজ্ঞার বাইরে নয়। বাতিল আইন চালানো প্রজাতন্ত্রের অবমাননা।

'সুপ্রিম কোর্টে ইংরেজি মেনে নেওয়ার তিন অর্থ দাঁড়ায়। এক অর্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা নয়, ইংরেজিও। দ্বিতীয় অর্থ সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রের অংশ নয়। দুই অর্থই সমান অগ্রহণযোগ্য। তৃতীয় অর্থ আরো আপত্তিকর। ইংরেজি পক্ষ বলছেন, সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে প্রণীত ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন অপূর্ণাঙ্গ। এই আইন 'বেসরকারি' প্রতিষ্ঠানে ইংরেজির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট'ও কি তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান? 'সুপ্রিম কোর্ট' বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব যতদূর জানি বিশ্বব্যাংক পর্যন্ত দেয়নি।'

৫

১৯৮৭ সালের ২২-২৪ এপ্রিল মালয়েশিয়া কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আপিল বিচারকদের চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত এক ইংরেজিতে লিখিত প্রবন্ধে আমি বলি, 'এ কথা সত্য যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দেশে বিচারের কাজে জনগণের ভাষা ব্যবহৃত হতো না। তখনকার দিনে বিচার্য বিষয়গুলো ছিল সংখ্যায় অল্প এবং তাদের প্রকৃতিও ছিল সহজ-সাধারণ। আজ যখন রাষ্ট্রীয় কর্মে জনসাধারণ বেশি করে শরিকানা দাবি করছে এবং সরকারও চাচ্ছে শাসনকর্মে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ, তখন জটিলতর ও হতবুদ্ধিকর বিচার্য বিষয় সিদ্ধান্তের জন্য আসছে। আমাদের মাঝে বিদেশী ভাষার ব্যবহার মৌলিক চিন্তাধারাকে ব্যাহত করে। ফলে একটা অবাস্তব আবহাওয়া এবং বিদেশী নজিরের ওপর এক মুগ্ধ নির্ভরপ্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে। 'যদি ন্যায়বিচার সদগুণ হয় এবং জনগণের কল্যাণের জন্যই যদি এর কাজ হয়, তবে তা জনগণের ভাষাতেই হওয়া উচিত।'

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ আমি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করি। সুপ্রিম কোর্ট বারের অভিনন্দনের উত্তরে আমি সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদের বরাত দিয়ে বলি, 'রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ,

উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারে। এই সুযোগ লাভ প্রায় অসম্ভব হবে যদি আইন বোঝার জন্য, ব্যবহারের জন্য এবং সর্বোপরি আইনের সমান আশ্রয় নেওয়ার জন্য জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে তার সম্মানের স্থানে প্রতিষ্ঠিত না করা হয়। রাষ্ট্রকর্মে রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করার জন্য কাউকে যেন মাথা হেঁট না করতে হয়। এশিয়া বা আফ্রিকার যেসব দেশ অনন্যোপায় হয়ে পিঠে পরাধীনতার অভিশাপ বয়ে আদালতে বিদেশী ভাষায় কর্ম সম্পাদন করে সেইসব দেশ আমার জন্য যথার্থ উদাহরণ নয়। যে দেশের ভাগ্য পরাধীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়নি এবং দেশ আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রেখে নিজের ভাষায় বিচারকার্যসহ সকল রাষ্ট্রকর্ম সম্পাদন করে সেই দরিদ্র প্রতিবেশী আমার অনুসরণযোগ্য। আমি নেপালের কথা বলছি।'

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা মাতৃভাষার মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি বোঝা, শেখা বা শেখানো যায়, তা পরভাষায় সম্ভব নয়। চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, কোরিয়ার 'যুব ব্যাঘ্ররা' মাতৃদুগ্ধসম মাতৃভাষায় পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করে আজ বড় হয়েছে। আমাদের ভাষায় পারঙ্গমতা সম্পর্কে আমরা অহেতুক সন্দিহান।

২ মে ১৯৯৫ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের বিদায়ী ভাষণে আমি পুনরুক্তি করি : 'বাংলাভাষার সংবিধান আমার জাতীয় ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। আমার সংবিধান দলিল হিসেবে যথেষ্ট যে, আইনের জটিল সমস্যা ও প্রশ্নাদির উত্তর বাংলায় দেওয়া সম্ভব। যে-ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধানের মতো একটি জটিল বিষয় রচনা করা সম্ভব হয়েছে, সেই ভাষায়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেন মানবিক সমস্যা নেই যার ওপর একটা সহজ সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। আমি পহেলা ফেব্রুয়ারি বলেছিলাম, 'পরভাষায় আইনচর্চার ফলে আমরা আইনশাস্ত্রে স্বাভাবিক সহজতা লাভ করিনি, তেমন কোনো মৌলিক অবদানও রাখিনি।'

আমি সেদিন আরো বলেছিলাম, 'আমি জানি আমার বক্তব্যের সঙ্গে ঐকমত্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অনেকের ধারণা, বাংলায় রায় লেখা হলে আমাদের রায় কেউ পড়বে না। আমাদের রায় পড়ার জন্য যেন সারা বিশ্ব রাত জেগে বসে আছে! যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ জড়িত এবং বাণিজ্যের সম্পর্ক, সেইসব দেশের বেশ কিছু লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখেছি সেখানে বাংলাদেশের 'ল' জার্নাল বা বই নেই বললেই হয়।' আমি অন্যত্র বলি : 'দেশের আদালতে যে দ্বৈতশাসন চলছে—নিচের আদালতে বাংলা ও ওপরের আদালতে ইংরেজি তার আশু অবসান হওয়া প্রয়োজন। যখন সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দলিল বাংলায় প্রণীত হতে পারে, অনিচ্ছা বা গড়িমসি দেখা যায় তা দূর করার জন্য আইনগত ব্যবস্থাবলম্বন আরোপ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।'

বিচারক-ভ্রাতৃবর্গের কেউ-কেউ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, 'বলা সহজ, উনি এত বাংলা-বাংলা করেন ইংরেজিতে না লিখে বাংলায় রায় লিখলেই পারতেন।' আমি কসুর করুল করছি, বাংলায় রায় লেখা বেশ কঠিন। আমি আমার কয়েকটা ইংরেজি লেখা বাংলা করতে হিমশিম খেয়েছি। নিজের ইংরেজি বাংলা বা নিজের বাংলার ইংরেজি না করাই ভালো। যা-ই হোক, আমি রায় বাংলায় লিখিনি। অবসরগ্রহণের সময় আমি বলেছিলাম, আমি জরিপ করে দেখলাম বাংলা ভাষার ব্যাপারে কোর্টে আমার বিচারক ভ্রাতৃবৃন্দ আমার মত সমর্থন করেন না, কিন্তু ভ্রাতৃপ্রতিম অনুকম্পায় তাঁরা আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করেননি। দেশের জনগণ যদি চান তাঁদের দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সব কাজ তাঁদের ভাষায় হবে, তবে তাঁদের প্রতিনিধিরা সংসদে যত দিন না প্রয়োজনীয় আইন পাশ করছেন, ততদিন বিচারকবৃন্দ স্বেচ্ছায় বাংলায় হাতেখড়ি দিতে চাইবেন না। আমি তাঁদের অসুবিধাটা বুঝি, পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে এই ভাষান্তর অত্যন্ত কষ্টদায়ক, অনেকের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। আমি আমার বক্তব্য রেখে গেলাম আগামীকালের জন্য। আজ শুধু কোনো প্রকার কাজ সারা।

জনাব মোস্তফা জব্বার আমার সম্বন্ধে যে অনুযোগ করেছেন সে-সম্পর্কে দুটো কথা। প্রধান বিচারপতি হিসেবে আমি কেন রাষ্ট্রভাষার ব্যবহারে উদ্যোগ নিতে পারিনি তা আমি উপরে উল্লেখ করেছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ ছিল দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা দান করা। সেই সরকার সর্বপ্রকার সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা মেনে চলে। সরকারের হয়ে জাতির উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণে আমি বলি, 'আইন-শৃঙ্খলা সংস্থাগুলোর উন্নয়নকল্পে, আইন সংস্কারের জন্য স্থায়ী কমিশন এবং অধস্তন আদালতের বিচারকের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ এবং প্রশাসন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আধুনিক ব্যবস্থাপনাবিদ্যায় ক্রমাগত প্রশিক্ষণের জন্য উন্নততর কিছু প্রকল্প-প্রতিষ্ঠানের কথা নিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করেছিলাম। অবশেষে, আমরা এই প্রত্যয়ে উপনীত হই যে, দেশের কি প্রয়োজন ও কিভাবে তা মেটানো যায় এবং দেশের মঙ্গল কিভাবে সাধন করা সম্ভব তা আমাদের চেয়ে নির্বাচিত সরকার ভালো বুঝবেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন। আমরা আর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন না হলে আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারি করার জন্য অনুরোধ করবো না। আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতার ব্যবহার সাংবিধানিকভাবে নির্দেশিত কেবল সীমিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন। জাতীয় সংসদের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা পরোক্ষভাবে ব্যাহত হলে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য পরিপোষণের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হবে না বলে আমার কাছে অনুমিত হয়।'

গত ২০ মার্চ জাতীয় নির্বাচনে ২০০৭ জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ শীর্ষক নাগরিক সংলাপে আমি আমাদের জাতীয় জীবনের সংকট

সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলি, 'যে ভাষার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে আমাদের স্বাধিকার-স্বাধীনতার আন্দোলন, সেই ভাষাকে গত ৩৪ বছরে আমরা অনাদরেই রেখেছি। মাতৃভাষাকে নিয়ে এমন বিমাতাসুলভ আচরণ কেবল ঔপনিবেশিকমুক্ত দেশেই দেখা যায়। ঔপনিবেশিকতার দাগ মানুষের মন থেকে গিয়েও যেতে চায় না।'

শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'পরিভাষাবিদরা যত খুশি গবেষণা করুন আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব। সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে। পরে তা সংশোধন করা হবে।' শেখ মুজিব পারেননি। আমাদের সংবিধানের ইংরেজি পাঠ না থাকলে কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হতো? সামরিক ফরমানের বলে এখন সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলোর ইংরেজি পাঠই তো প্রাধান্য পাচ্ছে।

আমাদের আগে যেসব রাষ্ট্রভাষা ছিল—সংস্কৃত ও ফারসি—তাদের প্রভাব এখনো মুছে যায়নি। ইংরেজির প্রভাব আরো বেশি দিন থাকবে। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে যে পারঙ্গমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করেছে তার সুবিধা আমরা হেলায় হারাতে চাই না। তবে আমাদের সবসময় মনে রাখা দরকার, এদেশের অতি অল্পসংখ্যক মানুষ (শতকরা ২?) ইংরেজি ব্যবহার করতে পারে। ইতিহাসের পাকেচক্রে এবং ঔপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং আমাদের কৃতকর্মের জন্য আজ ইংরেজি আমাদের অপরিহার্যও। কারণ বর্তমানে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক অনুযায়ী সংবিধানের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য বিধানের ইংরেজি বা বাংলা পাঠের মধ্যে ইংরেজি পাঠ প্রাধান্য পাবে। প্রস্তাবনা, নাগরিকত্ব, রাষ্ট্রপরিচালনা মূলনীতি-বিষয়ক ৮, ৯, ১০, ২৫ অনুচ্ছেদ, তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকারের ৩৮, ৪২, ৪৪ ও ৪৭ অনুচ্ছেদ, পঞ্চম ভাগ আইনসভার ৬৬, ৮০ ও ৯৩; ষষ্ঠ ভাগ বিচার বিভাগের ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০১, ১০২, ১১৬ ও ১১৭ অনুচ্ছেদ, দশম ভাগ সংবিধান সংশোধনের ১৪২ অনুচ্ছেদ, একাদশ ভাগ বিবিধের ১৪৫ক ও ১৫২ অনুচ্ছেদ এবং প্রথম তফসিল, তৃতীয় তফসিল এবং চতুর্থ তফসিলের সংশোধনের ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠেরই প্রাধান্য থাকবে।

কেমন করে যে হারিয়ে গেল সেই ১৫৩ অনুচ্ছেদটি যা বিধান দেয়, সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে। আমরা যে এই কলঙ্কের বোঝা বইছি তা সামরিক শাসনের দান। আমরা যেন সংকটকালে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে পারি না। মেজাজ খারাপ করলে যেমন কেউ-কেউ অনেক সময় উর্দু, হিন্দি বা ইংরেজিতে ফেটে পড়েন। এই দুরবস্থা দূর হওয়ার কি কোনো আশু সম্ভাবনা আছে? না, যদিনা বিপ্লব বা উপবিপ্লব ঘটে এবং নতুন গণপরিষদ কেবল বাংলায় সংবিধান প্রণয়ন করেন। চমকে যাওয়ার কিছু নেই। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে তেমন এক সুযোগ ছিল। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পরে ফ্রান্স একাধিকবার সংবিধান রচনা করেছে। যেমন রক্তনিশ্চে,

তেমনি সংবিধানরচনায় এবং তার রপ্তানিকর্মে সেই দেশের একটা সুনাম ছিল। ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। আমাদের তেমন উৎসাহ ও পারদর্শিতা নেই। আমরা তো পুরোনো জিনিস তালিতাপ্পা দিয়ে সংসার চালাই।

উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষার প্রচলনে প্রকৃত বা কল্পিত যে বাধা রয়েছে তা রোধ করার জন্য সরকারপক্ষ বা সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

যে-দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা সে-দেশের উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু সে-প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। আমি একবার লিখেছিলাম, জিন্নাহ সাহেব যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি হবে বলতেন, তা হলে কোনো ব্যত্যয় ঘটত না। আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি এক উল্লম্ফন-প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণে তা অস্বাভাবিক মনে হয়নি, তবে আমরা যেমন পাকিস্তানের দুই অর্থনীতির কথা এবং দুই অংশের অসাম্যের কথা যেভাবে চিন্তা করেছি, স্বাধীনতার কথা সোজাসুজি পরিষ্কারভাবে উত্থাপিত না হওয়ায় জাতিগঠনের কিছু প্রাথমিক কাজ সম্বন্ধে আমরা যেভাবে স্লোগানে সোচ্চার হয়েছি এবং যেভাবে ব্রত-উদ্‌যাপনের মতো প্রতিবছর দস্তুরমতো অঙ্গীকার করেছি, সেই অঙ্গীকার-পালনে যথার্থ কোনো চেষ্টা করিনি। বাংলা ভাষার বানানে ও লেখনরীতিতে যে নয়-ছয় নৈরাজ্য রয়েছে তার সেই অবস্থার দূরীকরণে আমরা যথার্থ উদ্যোগ নিইনি।

উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষা ব্যবহৃত হবে কি না, সে-বিষয়ে কী কী বিচার্য বিষয় হবে, তা স্থির করে দেশের সর্বশেষ আদালতের কাছে এক জনহিতকর মামলায় রায় নেওয়া যেতে পারত। যাঁরা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত ও সাহায্যপুষ্ট তাঁরা বাংলা ভাষার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নাও বোধ করতে পারেন। কোনো মার্জারশাবক কি নেই যিনি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে পারেন? মহামান্য রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন, এ-ব্যাপারে একটা রেফারেন্স করতে পারেন। যদি তিনি কোনো রেফারেন্স করতে না চান তবে এ-ব্যাপারে সমস্ত অস্পষ্টতা কাটাতে হলে সংসদীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে আইন প্রণয়ন করে ঠিক করতে হবে আমরা উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করব কি না এবং করলে কী বানান ও কী লেখনরীতি, চলতি না সাধু, ব্যবহার করব।

যে-ভাষায় বিচারকর্ম সমাধা হয় না সে-ভাষা বল সঞ্চার করে না, দুর্বল হয়ে থাকে। বাক্যগঠন ও বাক্যবিন্যাসে সে-ভাষায় ঋজুতা, দৃঢ়তা, নির্দিষ্টতা নিশ্চয়তার অভাব দেখা দেয়। আইন ও বিচারকার্যে ব্যবহারের ফলে একটি ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ইংল্যান্ডে বিচারকর্মে নরম্যান-ফ্রেঞ্চ ভাষা বাদ দিয়ে ইংরেজির প্রচলন ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শেকসপিয়ারের যুগে নাট্যশাস্ত্র ও

ব্যবহারশাস্ত্র যুগপৎ ঋদ্ধি লাভ করে। হাঙ্গেরিতে জার্মান ভাষা ছেড়ে বিচারকার্যে যেই জনগণের মাজইয়ার ভাষা ব্যবহার শুরু হলো সেই সে ভাষার সৌকর্য বৃদ্ধি পেল। নিজেদের ভাষার কল্পিত দৈন্যের অজুহাতে তার ভাষার স্বাস্থ্য হয়ে কোনো কাজের কথা নয়। আমাদের ভাষার দৈন্যমোচনের প্রথম পদক্ষেপই হবে আদালতে সেই ভাষার প্রচলন, সে-ব্যবহার তেমন দক্ষহস্তে না হলেও।

এক জাপানি পণ্ডিত বলেছিলেন, 'আমার ঠাকুরদাদার কাগজে জাপানি ভাষার চেয়ে বিদেশী ভাষাই ছিল বেশি, বাবার কাগজে জাপানি ও বিদেশী ভাষা প্রায় সমান সমান এবং আমরা এখন সব জাপানি ভাষায় কাজ করি। দেশের জনগণ, যার ৬০ ভাগ এখনো বাংলা লিখতে-পড়তে জানে না কিন্তু পড়ে শোনালে কিছু বোঝে, তাদের কাছে ভাষায় না-যাওয়া এক বড় গর্হিত কাজ।

বিধিদত্ত ক্ষমতাধর রাজা তাঁর ভাষায় রাজকার্য ও বিচারকর্ম সমাধা করতেন। রাজা ছিলেন ন্যায়ের উৎস স্বয়ং ন্যায়াধীশ। প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ চান দেশের সর্বস্তরে তাঁদের রাষ্ট্রভাষা চালু হোক। উচ্চ আদালতে তো বটেই।

আইন ও বিচার তো দেশের লোকের জন্য। বিদেশীদের সুবিধা-অসুবিধা গৌণ ব্যাপার। দেশের রায় বাংলায় লিখতে হবে, যাতে নিরক্ষরও শুনলে কিছু বুঝতে পারে। বিদেশীদের অসুবিধা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। সব সন্দেহের নিরসনকল্পে সংসদের দ্ব্যর্থহীন উদ্যোগ নেওয়া উচিত। ইংল্যান্ডে লর্ড উলফ (Lord Woolf) তাঁর অ্যাকসেস টু জাস্টিস-এ অবোধ্য ও স্বল্পব্যবহৃত লাতিন শব্দ বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেন এই ভেবে যে, সে-দেশের সাধারণ মানুষ আদালতে যেন সহজ প্রবেশাধিকার পায়। 'আমরা কি যাব না তাদের কাছে, যারা শুধু বাংলায় কথা বলে?'—এই আর্ত প্রশ্ন আমরা করেছি। আমরা উত্তর পাইনি। আমি অন্যত্র বলেছি, 'যাঁরা বাংলা ভাষাকে ঘিরে স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তা করতেন তাঁদের অনেকে আজ ক্ষমতায়। একসময় যাঁরা বলতেন রাষ্ট্রভাসানো বাংলা চান না তাঁরাও এখন ক্ষমতায়।' ক্ষমতায় যাঁরা সমাসীন এবং ক্ষমতায় যাঁরা আসীন হতে চান তাঁদের কাছে রাষ্ট্রভাষা আজ কোনো ব্যাপারই না। আন্তর্জাতিক আলোকিত জনমত যেখানে মাতৃভাষার পক্ষে, এমনকি, সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষা সংরক্ষণের পক্ষে সোচ্চার সেখানে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে যেভাবে আজও গড়িমসি করছি তা আমাদের অপদার্থতারই পরিচয় বহন করে। আমাদের বোধোদয় হবে কবে?

পরিশিষ্ট

এখন পৃথিবীতে বাংলার সূর্য অস্ত যায় না

জাফর আহমেদ রাশেদ : *আপনার প্রথমে মাতৃভাষা পরভাষা পরে বইটি নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। শুরুতে বইটির নাম নিয়ে বলুন।*

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : এই বইটির মধ্যে দুটো বিষয় রয়েছে, একটা হচ্ছে মাতৃভাষা আরেকটি অমাতৃভাষা। আমি বইটির একাধিক নাম নিয়ে চিন্তা করেছি—যেমন 'মাতৃভাষা বনাম অমাতৃভাষা', 'মাতৃভাষা বনাম দ্বিতীয় ভাষা', 'ইংরেজি ভাষার কি আমাদের পড়তেই হবে'? ইত্যাদি। কোনোটাই পছন্দ হলো না। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বইটার এখন যে-নাম সেই কথাগুলো খেয়ালে এল। ভাষা সম্পর্কে যেসব সামান্য কথা সাধারণভাবে ওই বইয়ে যা বলা হয়েছে তা যেন ওই নামে এক সূত্রে গাঁথা হলো।

রাশেদ : *ভাষা সম্পর্কে একটা বই করার কথা ভেবেই কি প্রবন্ধগুলো লিখেছিলেন?*

রহমান : না। এগুলো যে বই হিসেবে প্রকাশিত হবে তা কোনোদিন ভাবিনি। বছর দুয়েক আগে ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলো একসঙ্গে উলটেপালটে দেখে মনে হলো একটা বই হতে পারে। কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। চিন্তার সূত্র একটা ছিল, সেই চিন্তাটার ভেতর তেমন পরিবর্তন হয়নি।

রাশেদ : *বইটিতে ভাষা, মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। ভাষা, মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বলুন।*

রহমান : মাতৃভাষার দুটো গল্প শোনা যায়।

রাশেদ : *তার আগে ভাষা কী? তারপর মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা ...।*

রহমান : ভাষা কী সেটা তো বিরাট প্রশ্ন। যা দিয়ে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে তা-ই ভাষা। আমরা ইংরেজি 'মাদার টাং' থেকে 'মাতৃভাষা' শব্দটা পেয়েছি।

শব্দের প্রথম ব্যবহার সম্পর্কে যদি আমাদের অভিধান থাকত, তা হলে বুঝতে পারতাম কবে এই শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয়। মাতৃভাষার আরেকটা নাম জন্মভাষা। ইভান ইলিচের মতে, মাতৃভাষা শব্দটার প্রথম ব্যবহার হয় ফ্রান্সের লোরেন প্রদেশের গর্জ-এর গির্জায়। স্থানীয় মহিলারা ফ্রাঙ্কিস ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বুঝতেন না। তাঁদের সুবিধার্থে ফ্রাঙ্কিস ভাষা চালু করে তার নাম দেওয়া হলো মা-গির্জার ভাষা—মাতৃভাষা।

অক্সফোর্ড অভিধানে 'মাদারটাং'-এর তিনটি অর্থ দেওয়া হয়েছে। দেশী ভাষা, প্রকৃতির ভাষা ও মূল ভাষা। দ্বিতীয় অর্থে শব্দটির আর তেমন ব্যবহার নেই। ওয়াইক্লিফ মাদারটাং শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ইংরেজি বাইবেল অনুবাদ করায় তাঁর দেহাবশেষ কবর থেকে তুলে পোড়ানো হয়।

মাদার টাংয়ের একটা ব্যাপক অর্থ থাকতে পারে। দেশে আমার মায়ের ভাষা আমার মাতৃভাষা। বাঙালি মায়ের যে-সন্তান ইংল্যান্ডে থাকে তার ভাষাটা কী? একদিকে বলা যায়—হ্যাঁ, তার বাঙালি মায়ের ভাষা। আরেক দিক থেকে বলা যেতে পারে, যে-ইংল্যান্ড তাকে লালন-পালন করছে তার ভাষাও তো তার মাতৃভাষা। আর রাষ্ট্রের কাজকর্ম যে-ভাষায় চলে তা-ই রাষ্ট্রভাষা। আমাদের সংবিধানে বর্তমানকালবিষয়ক বাক্যে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। রাষ্ট্রভাষার গুরুত্ব তখনই স্বীকৃতি পাবে, যখন দেশের অফিস-আদালতে সেই ভাষা ব্যবহার করা হবে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বাংলা তেমন ব্যবহার হচ্ছে না। হাইকোর্ট ডিভিশনের দু-একটা রায় হয়েছে। না হওয়ার নানা কারণ বা অজুহাত দেওয়া হয়—আইনে পারিস্কার নির্দেশনা নেই, সব আইন এখনো বাংলায় নেই, আইনি পরিভাষা নেই। বাংলায় আইনবিষয়ক যথার্থ পরিভাষা নেই—অন্তত এই আপত্তি মোকাবিলা করার জন্য আমরা কয়েকজন মিলে একটা 'আইনকোষ' সঙ্কলন করার চেষ্টা করছি।

রাশেদ : *অফিস-আদালতে বাংলা চালু হচ্ছে না। তা হলে বাংলা চালু হবে কীভাবে? আপনি যেরকম বলেছেন, আইন করে?*

রহমান : যেখানে দোলাচলতা আছে সেখানে ভদ্রভাবে কাজ করতে গেলে আইন করতে হবে। অনেক স্বৈরতান্ত্রিক দেশে যিনি শাসক তাঁর কথাকে মানুষ মেনে নেয়। তুরস্কে ভাষা-সংস্কার নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানারকম বিতর্ক ছিল। কামাল আতাতুর্কের একটা ঘোষণায় সব সমাধান। আমাদের পরিভাষা নেই। এখন আমরা কী করব? হয় আমরা পরিভাষা তৈরি করব, নয় যে-ভাষা পাচ্ছি তা ব্যবহার করব। ইন্দোনেশিয়ায় এক আইনে প্রায় ৪০ হাজার বিদেশী শব্দ স্বাঙ্গীকরণ করেছিল। আমাদের কিছু করার ইচ্ছা আছে কি না সেখানেই আমার সন্দেহ।

রাশেদ : *মাতৃভাষার পাশাপাশি পরভাষা কি শিখতেই হবে?*

রহমান : ভাষার আপন-পর নেই। যে যখন যে-ভাষা শিখে ফেলবে, তখন সে-ভাষা তার হবে। ভাষার রাজ্যে ভিসা-পাসপোর্ট লাগে না। এখন ভাষাবিদরা বলছেন যে, একভাষিতা একধরনের নিরক্ষরতার মতো মন্দ। অন্য ভাষাভাষী লোকের সম্পর্কে জানতে হলে তাদের ভাষা শিখতে হবে। আজ যে-কোনো ভদ্রলোকের অন্তত তিনটা ভাষা শেখা ছাড়া উপায় নেই। এখন ঢাকায় বিদেশী ভাষা শেখার অনেক সুযোগ-সুবিধা হয়েছে। বিদেশী দূতালয়গুলো ফরাসি, জার্মান, জাপানি, রুশ ভাষা শেখাচ্ছে। আমাদের তরুণ ছেলেমেয়েরা অন্য ভাষা শিখতে বেশ আগ্রহী।

রাশেদ : *কিন্তু আমাদের এখানে দ্বিতীয় ভাষা বলতে সাধারণত ইংরেজিই বোঝানো হচ্ছে এবং ইংরেজির জন্য একটা মাতম আছে বলেও আপনি লিখেছেন।*

রহমান : ইংরেজির জন্য যে-মাতম সে উন্নাসিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেকে মাতৃভাষার প্রচলনকে দেশে শিল্পের বিপর্যস্ত জাতীয়করণের সঙ্গে তুলনা করে। জাতীয়করণের লুটপাটের সঙ্গে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনকে একই বিড়ম্বনা ভেবে যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের আপসোস তো একধরনের মাতম। বলতে গেলে ইংরেজিও আমাদের ভাষা। ওটাকে আপনি ঠাট্টা করে বেংলিশ বলতে পারেন।

রাশেদ : *ইংরেজিও আমাদের ভাষা?*

রহমান : তা ২০০ বছর ধরে আমাদের সঙ্গে ইংরেজির যে-চলাচল তা অচল করার কোনো প্রয়োজন নেই। একটা ভিনদেশী ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজি—তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই তো ভালো।

রাশেদ : *কিন্তু আমি বলছিলাম ইংরেজিগ্রস্ততার কথা, আপনি বলেছেন যার পেছনে বেনেবুদ্ধি ছাড়া আর কোনো সৎ উদ্দেশ্য নেই।*

রহমান : যে-কোনো শিক্ষার ভেতরে একটা বৈশ্য ভাব থাকে। শিক্ষা শুধু জীবিকার, না পূর্ণজীবনের জন্য—এ নিয়ে নানা কথা। কিন্তু শিক্ষা যদি জীবিকায় বা অর্থোপার্জনে সাহায্য না করে, জীবনে সাহায্য না করে, সেই শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর তেমন টান আসে না।

রাশেদ : *আমরা ইংরেজি ভালো শিখতে পারছি না, বাংলাও ভালো শিখতে পারছি না। আপনি এ-বইতে লিখেছেন যে, একজনও ঠিক যথার্থ ইংরেজি জানে কি না আপনার সন্দেহ আছে!*

রহমান : সেকথা বলেছি কি? এমন কথা বলা ঠিক না। আমাদের দেশে অনেকে ভালো ইংরেজি জানেন। আমি বোধহয় একথা লিখিনি যে, একজনও যথার্থ ইংরেজি জানে না।

রাশেদ : *বাংলা কি ভালো শেখা হচ্ছে?*

রহমান : না। ভাষাবিদরা বলেন যে, প্রথমে মাতৃভাষায় ভিত্তিটা গড়তে হবে, তার ওপর অন্য ভাষার ইমারত। আমাদের মাতৃভাষার ভিত্তিটাই বড় নড়বড়ে।

বানানে এখন পর্যন্ত কোনো সমতা বা প্রমিততা প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। এক 'বাঙালি'র ছ' রকম বানান। যতগুলো দৈনিক পত্রিকা আছে, প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা বানান লেখে। আইনশৃঙ্খলা না-মানার যে-প্রবণতা আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেটা বাংলা ভাষার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। ভাষার যদি এত বিশৃঙ্খলা, তা হলে তার খাসলতেও বিশৃঙ্খলার ভাব থাকবে।

রাশেদ : এ-প্রসঙ্গে ভাষা-সংস্কারের প্রশ্ন আসে।

রহমান : আমি গুরু মানি। আমি বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান অনুসরণ করি। কেবল কলমের জোরে খ এ ঋ দিয়ে খৃ করব অথবা প এ ঋ দিয়ে পৃ করব বা চন্দ্রবিন্দু বাদ দিয়ে দেব, এসবের মধ্যে আমি কোনো যুক্তি পাই না। প্রথম আলোর সম্পাদকীয়তেও চন্দ্রবিন্দুবিদ্বেষীদের পাঁয়তারা দেখে আমি খুব হতাশ হয়েছি।

রাশেদ : *আর বানান-সংস্কার?*

রহমান : বানান সংস্কার আমার মনে হয় আগের চেয়ে জটিল হয়ে যাচ্ছে। তরুণেরা এখন 'ণত্ব' 'ষত্ব' বিধান মানতে চায় না। অনেকে চন্দ্রবিন্দু বাদ দিতে চায়। বহুভাষাতেই অনুনাসিকতা আছে। কোনো কোনো ভাষায় এমন শব্দ আছে, হাঁচি ফেললে যে শব্দ হয় তা অনুসরণ করে একটা বিশেষ বর্ণ উচ্চারণ করতে হয়।

রাশেদ : *হাঁচি বোঝানোর জন্য বর্ণ আছে?*

রহমান : না, তা নয়। হাঁচি বোঝানোর জন্য না, হাঁচি ফেলার সময় যে-শব্দটা হয় তার কিছু প্রতিফলন ঘটে কোনো কোনো উচ্চারণে, তার মানে কোনো উচ্চারণ সঠিক করতে গেলে হাঁচি ফেলতে হয় না।

রাশেদ : *আপনি যেটা বললেন, তরুণরা মূর্ধন্য 'ষ' বা মূর্ধন্য 'ণ' লিখতে চায় না; কিন্তু এর মধ্যে দুটো দল আছে। একদলের প্রশ্ন, আমাদের উচ্চরণে দুটো 'ন' আছে কি না; আরেক দল জানে না তাই মানে না।*

রহমান : এর ভেতরে দুটো জিনিস থাকতে পারে। একটা হচ্ছে বিদ্রোহ, আরেকটা হচ্ছে আলস্য, আমার মনে হয় আলস্যটাই বেশি। আমি ভবিতব্যের কথা বলতে পারব না। মূর্ধন্য ণ একেবারে উঠে গেলে বিস্মিত হব না।

রাশেদ : *আমাদের সীমানার মধ্যে অন্য যেসব ভাষা আছে, যেগুলোকে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বলা হয়, সেগুলোর উন্নয়নের একটা চেষ্টার কথা বলেছেন,..সেটা কি আশা করা যায়?*

রহমান : কোনো ভাষাকে উপভাষা বলা আর পরিহাস করা প্রায় একই জিনিস। আমাদের দেশে প্রায় ২০টি ভাষা চালু আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অহোম ও ওড়িশ্যাকে বাংলার উপভাষা বলতেন। কথাটা আসাম বা ওড়িশ্যার মানুষ স্বীকার করে নেবে না। এটা তো একধরনের ভাষাসাম্রাজ্যিক চিন্তা। এখন ভাষাবিদরা মোটামুটি এটা মানেন যে, মাতৃভাষা শেখা সহজ, মাতৃভাষায় সম্পর্ক রাখা সহজ।

অমাতৃভাষায় কথা বললে নিজের বাপ-মা, নিজের সমাজ বা নিজের গোষ্ঠীর সঙ্গে একটা দূরত্ব বেড়ে যায়। বর্তমান জনসংযোগের যুগে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখি না। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো সহজ ও স্বাস্থ্যকর। কোনো ভাষার প্রতি বিশেষ প্রবণতা বা আসক্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে না। ভাষাকে অর্জন করতে হয়। সুতরাং ভাষার জন্মগত দোষ-গুণ কী আছে এ-সম্পর্কে ভাষাবিদরা একমত না। একদিক থেকে যে-কোনো ভাষার কাঠামোই বেশ জটিল। অনেকে বলেন যে ভাষা শেখার জন্য মস্তিষ্কের বিশেষ জায়গায় কতগুলো স্নায়ুর যন্ত্রপাতি আছে আর ১২ বছর পর্যন্ত সেগুলো মোটামুটি ভালো কাজ করে। আবার অন্যরা বলেন, ১২ বছরের পরেই তো আসলে ভাষা শেখার সময়। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কটা ভাষা শিখব। ব্যতিক্রমি মেধাবী ছাত্র একাধিক ভাষা শিখতে পারে, সেটা বড় জিনিস না। বড় জিনিস হচ্ছে, সমাজে অনেক লোক আছে, যারা একটির বেশি ভাষা শেখারও সুযোগ পাচ্ছে না। আমরা তাদেরকে অশিক্ষিত রাখতে চাই না, তাদের শিক্ষা দিতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেওয়া সবচেয়ে সহজ।

রাশেদ : *এজন্যই কি আপনি বলেছেন, অনুবাদ ও পরিভাষা তৈরির জন্য হাজারখানে লোক ভালো ইংরেজি জানলেই হয়?*

রহমান : বিদেশী ভাষা শেখার যে-অজুহাত দেওয়া হয়—আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগ, কাজের জন্য বিদেশে যাওয়া; এগুলোতে সর্বসাকুল্যে আর কত হাজারই-বা লোক লাগতে পারে?

রাশেদ : *হ্যাঁ, কিন্তু যারা একেবারে নিরক্ষর তাদের আগে শিক্ষিত করা দরকার মাতৃভাষায়।*

রহমান : একটা ভাষা ভালো করে শিখলে আরেকটা ভাষা শেখা অনেকটা সহজ হয়। প্রায় সকল ভাষার মধ্যে একধরনের সংযোগ-যোগাযোগ রয়েছে যা ভাষাবিদরা বুঝতে পারেন। কোনো কোনো ভাষাবিদ নাকি আড়াই ঘণ্টায় একটা নতুন ভাষা শিখতে পারেন!

রাশেদ : *এ-বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?*

রহমান : ভাষা শেখার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। আমি প্রথম ভাষা শুরু করি বাংলা, তারপর উর্দু, আরবি ও ইংরেজি। উর্দু দুসরি কেতাব পর্যন্ত। আরবি আমি আইএ পর্যন্ত পড়েছি। ম্যাট্রিকে পেয়েছিলাম চুয়াত্তর আর আই-এতে পেয়েছিলাম বেয়াল্লিশ না তেতাল্লিশ।

রাশেদ : *মানে আপনার অবনতি হয়েছিল?*

রহমান : হ্যাঁ। তার পরে অক্সফোর্ডে থাকার সময় রুশোর কঁত্রা দ্যু সোশাল পড়তে হতো, কিছু ফরাসি শিখতে হলো। পরীক্ষায় উদ্ধৃতিটা থাকত ফরাসিতে। ব্যাখ্যা করতে হতো ইংরেজিতে। দেশের বাইরে যেখানে কিছু বলতে হয়েছে আমি সেখানকার ভাষাতেই বলার চেষ্টা করি। কাঠমান্ডুতে নেপালি, পাপুয়া নিউগিনিতে

টক পিজিন, পাকিস্তানে উর্দু এবং জার্মানিতে দু-চার মিনিট জার্মান ভাষায় কথা বলেছি। ভাষার ক্ষেত্রে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী হয়তো বলা যায় না।

রাশেদ : *মজা আর কি!*

রহমান : হ্যাঁ, সবসময় মজা হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন 'জনযুদ্ধ' হিসেবে চিহ্নিত হলো তখন আমাদের বাড়িতে সোভিয়েত পত্রিকা আসত। রুশ ভাষা শেখার জন্য পত্রিকায় একটা ক্রোড়পত্র থাকত। তখন আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। রুশ ভাষা শেখার ক্ষেত্রে আমি এগুতে পারিনি। দু দশক পরে আবার চেষ্টা করি, লাভ হয়নি। বহু কষ্টে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমার পুরনো রেজিস্ট্রেশন-নম্বর খুঁজে বের করে চীনা ভাষা শেখার জন্য ভরতি হলাম। ভরতি হওয়ার কিছুদিন পরেই আমি অস্ট্রেলিয়া গেলাম, মাস দু-তিনেক পরেই আবার আমেরিকা চলে গেলাম। আমি চীনা ভাষায় পরীক্ষায় ফেল করলাম।

রাশেদ : *ভাষাবিজ্ঞানীরা যতই বলুন আড়াই ঘণ্টায় ভাষা শেখা যায়, কাজের বেলায় কিন্তু তা দেখা যায় না।*

রহমান : আমি বেশ কয়েকজনকে দেখেছি, একাধিক ভাষায় বেশ গ্যাটগাট করে কথা বলতে। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার শেখার ক্ষমতা কতদূর তার ওপর। এমন হতে পারে, আপনার বুদ্ধিকাঠামোটা এমন যে, তা পরভাষাকে সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করতে পারে না।

রাশেদ : *আপনি বলেছেন প্রতি বছর ১২টি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। বিপন্ন ভাষাগুলোর ভবিষ্যৎ কী?*

রহমান : ভাষাবিদরা এগুলোকে মুমূর্ষু ভাষা, বিপন্ন ভাষা, লুপ্ত ভাষা বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যে-ভাষাতে শুধু বয়স্ক লোকেরা কথাবার্তা বলছে এবং অল্পবয়স্করা যে-ভাষা শিখছে না, সেটা মুমূর্ষু ভাষা। আর যে-ভাষা অল্পবয়স্করা শিখছে কিন্তু যতটা তার কদর করা দরকার ততটা করছে না এবং সংখ্যালঘুদের ভাষাকে বরং বেশি মর্যাদা দিয়ে তা লিখছে-পড়ছে সে ভাষা বিপন্ন ভাষা। এমন হতে পারে তাদের নিজের জীবনে হয়তো তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে বিপদে পড়েছিল অথবা তারা অবজ্ঞা বা পরিহাসের সম্মুখীন হয়েছিল। লুপ্ত ভাষা হচ্ছে, যে-ভাষায় এখন কথা বলার কেউ নেই, অর্থাৎ কেউ এখন বেঁচে নেই।

মৃতভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করা কঠিন ব্যাপার। বিপন্ন ভাষার জন্য দরকার অভিধান, আরো গবেষণা আরো রেডিও-টেলিভিশনে তার ব্যবহার। যে-ভাষা বিপন্ন সে-ভাষার বাপ-মা'র নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলবেন, এটা হবে সবচেয়ে উত্তম আত্মরক্ষামূলক পন্থা। আরেকটা জিনিস, ভাষা যেমন মরে যাচ্ছে হয়তোবা নতুন ভাষাও তৈরি হচ্ছে। কখন ভাষাটা সম্পূর্ণ পরিচিত আকারে কাছে আসবে আমরা তা জানি না। প্রথমে ভাঙাচোরা অবস্থায় আসবে। পিজিন, ক্রেওল, পিজিন-ক্রেওল আকারে।

রাশেদ : *বাংলা ভাষার কি বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে?*

রহমান : মোটেই না। সারা পৃথিবীতে এত লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে যে এখন ইচ্ছে করলে আমি অহঙ্কার করে বলতে পারি যে একসময় ইংরেজি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ ভাষার সূর্য যেমন অস্ত যেত না, তেমনি এখন বাংলা ভাষার সূর্য আর অস্ত যায় না। বাংলাটা এখন পৃথিবীর ষষ্ঠ (না, চতুর্থ) মহাভাষা। লন্ডনে বাংলা ভাষা হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা। আপাতত এই ভাষার মরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

রাশেদ : *আপনি 'টক পিজিন'-এর বাংলা করেছেন 'বেপারি ভাষা'। পৃথিবীটা যেভাবে যোগাযোগ তৈরি করছে, আপনার কি মনে হয় সংযোগের ভাষা হিসেবে পিজিন আরো প্রসারিত হবে?*

রহমান : পিজিন বা ক্রেওল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। এখন সবচেয়ে ব্যবহারিক ভাষা হচ্ছে ইংরেজি। রুশ ভাষার যে-রমরমা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তা আর নেই। ভবিষ্যতে আমার মনে হয় চীনা ভাষার কদর বাড়বে। চীনা ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার যাতায়াত তেমন ছিল না। শুধু সমুদ্রকূলবর্তী যেসব বন্দর আছে, সেখানে চীনা পিজিনের জন্ম হয়েছে। পিজিন সাধারণত সেসব জায়গায় হয় যেখানে একাধিক ভাষার সংঘাত বা সমন্বয় অথবা প্রতিরোধ থাকে। এটা একধরনের প্রতিক্রিয়াজাত ভাষা আর কি!

রাশেদ : *আপনার বইটা ভাষা নিয়ে। এখন পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে, এখন আমরা কী উদ্যোগ নিতে পারি?*

রহমান : মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা নিয়ে যেসব কাজ করার সুযোগ আছে, বিশেষত বড় কাজ করার সুযোগ আছে সেসব কাজ আমরা করতে পারব না। আমাদের উৎসাহও তেমন নেই, টাকা-পয়সাও তেমন নেই। আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউটের এখনো পর্যন্ত মাথা বাঁচানোর ছাদ হয়নি। সুতরাং এটা সেরকম—সাত মণ তেল হবে, তারপরে মাতৃভাষারা নাচবে। সময় লাগবে। আমরা ভাষার দলিল সংগ্রহ করতে পারি। নিজের ঘর আগে দেখো, 'চ্যারিটি বিগিন্‌স্ অ্যাট হোম'-নীতি অনুযায়ী মাতৃভাষা সম্পর্কে বহু আরাদ্ধ কাজ আমরা শুরু করব, বিশেষ করে দেশের ভেতরে বাংলা ভাষা ছাড়া অন্যান্য মাতৃভাষার ক্ষেত্রে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাষা নিয়ে কাজ করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ট কমিশন এবং সরকারি আনুকূল্যে ও দাক্ষিণ্যে রাজশাহীতে উত্তরাঞ্চলের ভাষা, সিলেটে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভাষা, চট্টগ্রামে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের, খুলনায় পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলের ভাষা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা করা যেতে পারে। আমরা হিমালয় অঞ্চলের ভাষা নিয়ে কাজ করতে পারি। মালয়েশিয়া, বার্মা এসব দেশের সঙ্গে আমাদের শিক্ষক-বিনিময় করে সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে আরো বেশ কিছু কাজ করতে পারি।

রাশেদ : মাতৃভাষার মাধ্যমে যখন সাধারণ এবং উচ্চশিক্ষার কথা বলা হয় তার মধ্যে অনেকে গরিব মানুষকে আরো গরিব করে রাখার প্রয়োচনা দেখেন। আপনি কী মনে করেন?

রহমান : ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ থাকে। আমাদের দেশে আছে, অন্য দেশেও আছে। যেমন—ধর্মের জন্য আরবি, চাকরিবাকরির জন্য ইংরেজি, তার পরে আমরা বাংলা শিখছি নিজেকে বোঝার জন্য এবং বাংলাভাষা অপরজনকে বোঝা বা বোঝানোর জন্য। যখন বাংলার মান হবে তখন বাংলা ভাষা শিখলে কেউ নিজেকে গরিব ভাববে না। যতদিন আমরা ইংরেজিকে প্রাধান্য দেব এবং তার জন্য হন্যে হব ততদিন আপনার কথায় ভেতরে কিছু সত্য থাকবে। একজন শুধু বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, আর-একজন ইংরেজি-বাংলা দুটোই জানে, এখন যে দুটো ভাষা জানে তার একটা ক্রেডিট থাকবে। এরকম অভিযোগ থাকার কারণ, ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য বা প্রতিবন্ধকতার জন্য বাংলা ভাষায় তেমন উন্নতি হচ্ছে না। আর এ-ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একধরনের হীনম্মন্যতাও বিরাজ করছে।

প্রথম আলো সাক্ষাৎকার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

সর্বস্তরে বাংলা চালুর জন্য প্রয়োজনে আইনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে

ভোরের কাগজ : আপনি একজন ভাষাসৈনিক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আপনি শুধু সক্রিয় অংশগ্রহণই করেননি, নেতৃত্বও দিয়েছেন। সেই সময়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলুন।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : দেখুন, 'ভাষাসৈনিক' কথাটা আমার কেমন যেন ভারি আত্মম্ভরী ও ঢঙি মনে হয়। ওই শব্দটা আমি ব্যবহার করতে চাই না। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় আমরা তখন ছাত্র। সেই সময় আমাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় রাজনৈতিক আদর্শ ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। যখন জিন্নাহ সাহেব বললেন যে উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন আমাদের মনে হয় যে, তিনি যেন আমাদের অতি প্রিয় রাজনৈতিক নীতি-আদর্শ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি একটা বড় আঘাত করলেন।

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তাদের মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। ইতিহাসে দেখা যায়, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সাধারণত তাদের ভাষা অধিকারের জন্য আন্দোলন করে। সেদিন আমরা কিন্তু স্বার্থপরের মতন বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন করিনি। আমাদের আন্দোলন তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষার বিরুদ্ধে ছিল না। বরঞ্চ পশতুভাষী, বালুচভাষী এমনকি উর্দুভাষীদের অনেকেও বাংলা ভাষার আন্দোলকে সেদিন সমর্থন করেন।

ভো. কা. : ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম দলের নেতৃত্বে ছিলেন আপনি। তো আপনার সেদিনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা বলবেন কি?

মু. হা. রহমান : সেই ১৪৪ ধারা ভাঙার ব্যাপারে আমার তেমন কোনো নেতৃত্ব ছিল না। ওই ১৪৪ ধারা ভাঙার ক্ষেত্রে একটু ইতস্তত ভাব ছিল। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। সেই সময় একটা উত্তেজনাময় আবহাওয়ায় ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে কি না-হবে, এসব মানুষের মনে নানা প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। যেহেতু আগের রাতে আমরা কয়েকজন মিলে ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম সেহেতু আমার মনে হয়েছিল, ওই প্রস্তাব অনুযায়ী আমার কিছু করার ছিল। সাধারণভাবে বাঙালি মুসলমান ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভাঙার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। কলকাতায় ১৪৪ ধারা ভেঙে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করার আমার সামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। যা-ই হোক, আমি এক্ষেত্রে মনে করলাম যে, আমার কিছু করার আছে। আমার বন্ধু মুহম্মদ সুলতানকে বললাম যে, 'তুই আমার 'মযূরপঙ্খী' (সাইকেল আর কি)-টা দেখিস, আমি চললাম।' তারপর যখন ১৪৪ ধারা অমান্য করে এগিয়ে যাচ্ছি তখন দেখি যে, শরীর থেকে একটা গরম ভাপ বেরোচ্ছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদেরকে একটা ট্রাকে তুলে নিল। ট্রাকে তুলে নেওয়ায় এক ধরনের স্বস্তিই পেলাম। আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, 'আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' আমি বললাম, 'কোথায় আবার নেবে? দূরে কোথাও নিয়ে চ্যাংদোলা করে একটা পচা পুকুরে ফেলে দেবে।' আমাদের তেজগাঁও থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথমে হাজতঘরে রাখা হলো। সেখানে আরো দুয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল। খুবই ছোট জায়গা। চারপাশে প্রস্রাবের দুর্গন্ধ। তারপরে আমাদের একটা বড় ঘরে রাখা হয়। সেখানে পোড়া খিচুড়ি খেয়ে মেঝেতে আমরা লম্বা হলাম। ভোর ৩টার দিকে শুনি কেউ-কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে। আমি শুনতে পেলাম যে, ঢাকায় গুলি হয়েছে। তখন গুলি হওয়া মানে কঠিন ব্যাপার। সে-সময় গুলিতে ১ জন লোক মারা গেলে হুলুস্থুল প্রতিক্রিয়া হতো।

যাই হোক, পরের দিন আমাদেরকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো। একজন আমাকে বললো, মর্নিং নিউজ আমাদের সম্পর্কে খুব খারাপ কথা লিখেছে। মর্নিং নিউজ পোড়ানো দরকার। কারা যেন মর্নিং নিউজের কয়েকটা কপি নিয়ে পোড়াতে শুরু করলো। আমরা তখন পুলিশের ট্রাকের ভেতরেই। একজন আমাকে বললো, ওই সেনা-পুলিশের সামনে উর্দুতে বতৃতা দিতে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি উর্দুতে বক্তৃতা দিলাম। বললাম, যেমন আপনারা আপনাদের মাতৃভাষাকে ভালোবাসেন. আমরাও তেমনি আমাদের মাতৃভাষাকে ভালোবাসি। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। এর পরে জেলে গেলাম। কিছুদিন পর জেল থেকে বেরিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।

ভো. কা. : ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এ-প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কী?

মু. হা. রহমান : ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য তো আছেই। বিশেষ করে যখন সেই আন্দোলনটা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিণতি লাভ করল। ভাষার ওপরে ভিত্তি করে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো যে-রাষ্ট্রের নাম এবং যে-রাষ্ট্রের ভাষার নাম এক সেখানে একধরনের দারুণ সামঞ্জস্য-সৌকর্য থাকে। বাংলা ভাষার নামে আমাদের দেশের নাম। সেদিক থেকে আমরা অবশ্যই আনন্দিত। আমরা গর্ববোধ করি। আর কোন আন্দোলন কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা বলা মুশকিল। সেই যে বোস্টনের টি-পার্টি—যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধিত্ব তা যখন চায়ের ওপর শুল্ক আরোপ করল তখন বোস্টনের তরুণেরা সেই যে চায়ের পেটি আটলান্টিকে ফেলে দিল। তারপর তো দেখেছি যে, সেই বোস্টন টি-পার্টি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হলো। আমরা সেদিন স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিনি; কিন্তু তার ভেতরে বীজ ছিল। নানাজনে নানাভাবে পরে চিন্তা করেছে। যেমন অনেকে বলেন, লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী দুটো রাষ্ট্র হওয়া উচিত। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক আইনি তর্ক হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত যখন তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হওয়ার পরও গণপরিষদ ডাকল না তখন আর অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। কেউ-কেউ বলেন যে, দুটো পাকিস্তানের দুজন প্রধানমন্ত্রীর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পক্ষে কোনো কোনো গোষ্ঠীর ভেতর একটা সমর্থন ছিল। যাই হোক, এসব বিতর্ক শেষ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো—ভাষা আন্দোলনের একটা বড় পরিণতি। এমন সফল পরিণতি অনেক সময় ঘটে না।

ভো. কা. : একুশের যে-চেতনা—বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের চেতনা—এই চেতনারই উত্তরাধিকার আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আপনার কি মনে হয়, সুকৌশলে এই চেতনা থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে?

মু. হা. রহমান : আমার তা মনে হয় না। এই চেতনার যদি কেউ বিরোধিতা করে—আমরাই তার বিরোধিতা করছি। আমাদের শত্রুর কোনো দরকার নেই, শত্রু আমাদের মধ্যেই রয়েছে। আমি ঠিক শত্রু বলব না, একুশের চেতনার বিরোধী লোক আমাদের ভেতরেই রয়েছে।

ভো. কা. : আমাদের জাতীয় জীবনে এখন এক চরম সংকটকাল চলছে। এই সংকটাকীর্ণ সময়ে আমাদের জন্য একুশের চেতনার আলোকে কি দিকনির্দেশনা থাকা উচিত এবং এই ভয়াবহ সংকট থেকে উত্তরণের উপায়ই-বা কী?

মু. হা. রহমান : দেখুন, একুশের চেতনা কোনো তাবিজ বা মন্ত্র নয়। অতীত থেকে যেমন শেখা যায়, তেমনি অতীত থেকে ভুল কিছু শেখারও আশঙ্কা থাকে। আমাদের একুশের চেতনা এখন ৪২ বছরের পুরোনো হয়ে গেছে। এই চেতনা থেকে আলো পাওয়া বা উৎসাহ-উদ্দীপনা পাওয়া খুব কঠিন। বর্তমান সমাজ নির্ভর করছে বর্তমান সময়ের তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর। তরুণসম্প্রদায়ের কাছে

একুশের চেতনা অনেক পুরোনো ব্যাপার। তবে যেহেতু আমাদের সমাজে এইরকম তেমন একটা সংগ্রামের ঐতিহ্য ছিল না; সেই দিক থেকে—পেছনে ফিরে তাকিয়ে কোনো উদ্দীপনা-উৎসাহ পেতে হলে একুশে আন্দোলনের কথা চিন্তা করতে হবে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বর্তমান সমাজ কীভাবে গ্রহণ করবে তা বলা মুশকিল। আসলে একুশের চেতনার ভেতরে কোনো জাদু-মন্ত্র নেই। বর্তমানে যদি আমরা কাজ না করি—যার যা কাজ তা পালন না করি একুশের চেতনার কথা বলে কোনো লাভ হবে না।

ভো. কা. : মহান ভাষা আন্দোলনের এত বছর পরও সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। কেন হলো না?

মু. হা. রহমান : আমরাই করতে চাইনি। যাদের হাঁটাপথে অভ্যেস, যারা এতদিন ইংরেজিতে কাজ করে এসেছে, তারা নতুন পথে নতুন করে হাঁটতে চায় না। আমি একবার বলেছিলাম যে, যদি '৫২ সালে বা '৪৮ সালে জিন্নাহ সাহেব বলতেন যে, ইংরেজিই আমাদের রাষ্ট্রভাষা থাকবে—তা হলে আমার মনে হয় না যে আমাদের কোনো মাথাব্যথা থাকত। এখন, বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা যতই গর্ব করি-না কেন, বাংলা ভাষার যে দৈন্য রয়েছে তা দূর করার জন্য যে-পরিশ্রম করা দরকার তা সেই ঘাটতি-অসুবিধা ইতিমধ্যে আমরা দূর করিনি। শেখ মুজিব সেই ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে বলেছিলেন 'পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তার পরে বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না ... আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা চালু করে দেব, সে-বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে। পরে তা সংশোধন করা হবে।' যার যা আছে তা-ই নিয়ে এই সংগ্রামের ডাকে আমরা শরিক হতে পারিনি।

ভো. কা. : আপনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বধায়ক সরকারেরও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। সে-সময় অফিস-আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগও আপনি নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা আর অগ্রসর হয়নি। এক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি কোথায়?

মু. হা. রহমান : এর মূল সমস্যা হচ্ছে—একদিন সকালবেলায় উঠে বলতে হবে বাংলা ভাষা ছাড়া আর কিছু চলবে না। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, তরুণ ছেলেরা যখন গাড়ি ভাঙতে গেছে তখন সবাই গাড়ির ইংরেজি নম্বর প্লেট বাংলায় পালটেছে। অবশ্য আমি মনে করি না যে, বাংলা প্রচলনের জন্য আর ভাঙাভাঙি করার দরকার আছে। নিশ্চিত করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি দরকার হয় তা হলে আইনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আইনি সিদ্ধান্ত নিলে পরে হয়তো সম্ভব হবে। তা ছাড়া আমার মনে হয় না যে, আমরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে পারব। ফেব্রুয়ারি মাস এলে নড়াচড়া করি। তার পরে ভুলে যাই। যদিও আমরা বলি যে, বাংলা ভাষা ব্যবহার না করলে সেটা অসদাচরণ হিসেবে দেখা হবে। কিন্তু আমি তো এ-পর্যন্ত দেখিনি যে, বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কাজ করেছেন বলে

কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ হয়েছে। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আমাদেরই দোলাচলতা রয়েছে, তা ঝট করে ফেলে দেওয়াও যাচ্ছে না। আর ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না বলেই আমরা এতদিনও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে পারিনি।

ভো. কা. : ইদানীংকালে দেখা যাচ্ছে দেশে ইংরেজি শিক্ষার একটা হুজুগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান সমাজে এই প্রবণতা অধিক পরিলক্ষিত হয়। আপনি কি মনে করেন এর মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা দেখানো হচ্ছে বা এই প্রবণতার ফলে আমাদের সমাজ জীবনে কোনো ক্রাইসিস দেখা দিতে পারে?

মু. হা. রহমান : শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বেই এখন ইংরেজিপ্রীতি বেড়েছে। কেউ-কেউ বলে ইংরেজি-রোগ। রক্ষণশীল সাম্যবাদী চৈনিক প্রতিনিধিরাও আন্তর্জাতিক সভায় কোনো কোনো সময় ইংরেজিতে কথা বলেছেন। ইংরেজির এত প্রাধান্য, এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি চিন্তা করেন যে, কত পার্সেন্ট লোক ইংরেজিতে কথা বলে—তা হলে অবাক হবেন। সারা বিশ্বে মাত্র দুই শতাংশ লোক ইংরেজিতে কথা বলে। কিন্তু ইংরেজির যে কতগুলো গুণ—ব্যবসায়-বাণিজ্য, আইন, আন্তর্জাতিক আইন, বিজ্ঞানচর্চায়—এই ভাষা যে-অগ্রগতি সৌকর্য অর্জন করেছে—সেই ভাষার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখতে হবে। ইংরেজি তো বাংলাদেশের অন্যতম ভাষা। দুশতাধিক বছর ধরে সেই ভাষার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, সেই সম্পর্কে পরাধীনতার কালিমা আছে বলেই এ-সম্পর্কে আমাদের সহজ দৃষ্টিভঙ্গি নেই। যেসব দেশ ইংরেজদের অধীন ছিল না তারা যেভাবে ইংরেজি শেখে আমরা শিখি না। ইংরেজি নিয়ে আমাদের হীনম্মন্যতা থাকার জন্য আমরা মাতৃভাষার অনাদর করেছি। আজ যখন আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করছি তখন আর অযথা তর্ক কেন?

ভো. কা. : আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী রয়েছে—যাদের আছে নিজস্ব ভাষা। এমনকি অনেক নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার বর্ণমালাও আছে। কিন্তু সে-সকল ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ নিজস্ব ভাষা হারিয়ে আজ অস্তিত্বের সংকটে। এটা নিশ্চয়ই একুশের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ-বিষয়ে কার কী করণীয় রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

মু. হা. রহমান : একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতি সম্মান জানিয়ে ইউনেস্কো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর ফলে আমাদের ওপর একটা কর্তব্য বর্তেছে। পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি আমাদের মর্যাদাশীল হতে হবে। বিশেষ করে নিজের দেশে। আমাদের দেশে গোটা বিশেক ভাষা চালু আছে। ছেলেমেয়েদের বারো বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে যেসব মাতৃভাষা মুমূর্ষু বা সংকটাপন্ন তাদের সাহায্য করতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদের বর্ণমালা, তাদের

অভিধান, তাদের বচন-প্রবচন সম্পর্কে আমাদেরকে আরো ওয়াকিবহাল হতে হবে। এর জন্য মাতৃভাষার পক্ষে একটা আবহ সৃষ্টি করা দরকার। কোনো ভাষাই যে ছোট নয়; কোনো ভাষাই যে সহজ না—এ-ধরনের একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের থাকা দরকার।

ভো. কা. : একুশের চেতনার আলোকে আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য আপনার বক্তব্য কী?

মু. হা. রহমান : না, নতুন প্রজন্মের জন্য আমার এমন কোনো বক্তব্য বা বাণী নেই। নতুন প্রজন্ম তাদের নিজের পথ নিজেই করে নিতে পারবে। যেখানে প্রয়োজন—সেখানে যেন আমরা তাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। নতুন প্রজন্মের অনেকে মাতৃভাষা চর্চার ব্যাপারে পরিশ্রম করতে নারাজ। তারা বাংলা বানান যেমন পারছে তেমনই করছে। এর জন্য আমরা তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরাই দায়ী। আমরাই বানানের প্রতি ঠিকমতো শ্রদ্ধাশীল নই। এক 'বাঙালি' বানান আমরা ৬ রকমে করে থাকি। চন্দ্রবিন্দু আমরা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছি। শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে চন্দ্রবিন্দু বাদ। দন্ত্য-ন-মূর্ধন্য-ণ নিয়ে খিটিমিটি লেগে আছে। এরকম একটা অগোছালো অবস্থার সৃষ্টি করলে নতুন প্রজন্মকে আমরা আকৃষ্ট করতে পারব না। এই প্রজন্মের জন্য একটা সহজ সুন্দর এবং সুখকর দৃষ্টান্ত রাখতে হবে। তা হলে তারা মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং মাতৃভাষার উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহী হবে।

ভো. কা. : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

মু. হা. রহমান : আপনাকেও ধন্যবাদ।

ভোরের কাগজ সাক্ষাৎকার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

একুশ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করাটা আইনসঙ্গত ছিল না

মহান ভাষা আন্দোলনে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। একটি রাষ্ট্র বা দেশের নাম যখন সেই দেশের ভাষার নামে হয়, তখন একটা বড় নাড়ির যোগ ঘটে। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আজ ষষ্ঠ মহাভাষা। বাংলার সূর্য অস্ত যায় না এমন অহংকার আজ আমরা করতে পারি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা, ভাষাসৈনিক, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান দৈনিক আমার দেশ-এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ভাষা আন্দোলন ও বাংলাভাষা সম্পর্কে এ-অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অমর একুশে উপলক্ষে তাঁর এ-সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষাৎকারে তিনি একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটির স্মৃতি, ১৪৪ ধারা কীভাবে ভেঙেছিলেন, ভাষা আন্দোলনের অর্জন, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষা, ভাষা আন্দোলনের দাবি কতটুকু পূরণ হয়েছে, ভাষা আন্দোলনের গোপন সরকারি দলিলাদি, বিচারপতি এলিস কমিশন রিপোর্ট ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলেন।

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, ভাষা আন্দোলনের সরকারি গোপন দলিলাদি এখন পর্যন্ত জনসমক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। এ-ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী ও নাগরিকসমাজ তৎপর হতে পারেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশে বিরাজমান অস্থিরতা জন্য এদিকে আমরা নজর দিইনি। ঐ-প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ করে বলেন, আমাদের দেশের আর্কাইভস বা সরকারি মহাফেজখানা একটা অনাদরের প্রতিষ্ঠান।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, ভাষা আন্দোলন আমাদের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্রকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। আজ দেশে যে বিপুল সংখ্যায় বই প্রকাশিত হচ্ছে সেটা আনন্দের কথা। তিনি বলেন, বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রচলন এখনো হয়নি। তিনি মন্তব্য করেন, বাংলা একাডেমীর উচিত ছিল অনুবাদকর্মের ওপর জোর দেয়া। সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ নিচে দেয়া হলো :

প্রশ্ন : প্রথমেই ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার বিশেষ অনুভূতির কথা জানতে চাই।

উত্তর : ভাষা আন্দোলনের বয়োবৃদ্ধিতে আমার তেমন কোনো বিশেষ অনুভূতি নেই। তবে একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটা আমার কাছে নানা কারণে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ। আজকাল আমাদের গর্ব করার কারণ হচ্ছে এই দিনটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা নিয়ে যে-বিরোধ এবং ভাষা নিয়ে মাঝেমধ্যে যে-শুদ্ধিকরণের চেষ্টা হয় তাকে আন্তর্জাতিকভাবে অস্বীকার করে বরং নিন্দা করে বাংলাদেশের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ একটি আন্তর্জাতিকতার রূপ নিয়েছে। এই নিয়ে আত্মপ্রসাদের অবকাশ রয়েছে বৈকি!

প্রশ্ন : বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে ১৪৪ ধারা ভাঙতে আপনার নেতৃত্বে প্রথম দশজনের মিছিলটি বের হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা বলুন।

উত্তর : ১৪৪ ধারা অমান্য করার ক্ষেত্রে আমার তেমন কোনো নেতৃত্ব ছিল না। আগের দিন ২০ ফেব্রুয়ারি আমরা কয়েকজন মিলে ১৪৪ ধারা অমান্য করার প্রস্তাব নিয়েছিলাম। পরের দিন সভায় যখন দশ-দশজন করে আইন অমান্যের কথা পাশ হলো কিন্তু তবু যখন এ-ব্যাপারে একটু ইতস্তত ভাব দেখলাম তখন কিক-স্টার্ট হিসেবে আমরা ক'জনে ১৪৪ ধারা অমান্য করি এই বিবেচনায় যে, ওই ১৪৪ ধারা জারি করাটা আইনসঙ্গত ছিল না।

প্রশ্ন : একুশের যে-স্মৃতি এখনো আপনার চোখে ভেসে ওঠে, সেটি আমাদের বলুন।

উত্তর : একুশের কোনো বিশেষ স্মৃতি ঝট করে মনে আসছে না। একেক সময় একেক ঘটনার কথা মনে হয়।

প্রশ্ন : আমাদের ভাষা আন্দোলন কি ভাষার দাবিতে বিশ্বের প্রথম আন্দোলন?

উত্তর : আমাদের ভাষার আন্দোলনে বিশ্বের প্রথম ভাষা আন্দোলন—এমন দাবি করতে চাই না। পূর্ব ইউরোপের বহু ভাষাগোষ্ঠী নিজ নিজ ভাষার জন্য বহু নির্যাতন সহ্য করেছে। তবে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সাফল্যের একটা নিটোল দৃষ্টান্ত খাড়া করতে আমাদের ভাষা আন্দোলনের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণ করে ইউনেস্কো একটা সঠিক কাজ করেছে।

এ-ব্যাপারে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের আমাদের আরেক রফিক ও সালামের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড-এর পক্ষে তাঁরা একটা সঠিক ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন : ভাষা আন্দোলনে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন কী?

উত্তর : ভাষা আন্দোলনে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। একটি রাষ্ট্র বা দেশের নাম যখন সেই দেশের ভাষার নামে হয় তখন একটা বড় নাড়ির যোগ ঘটে।

প্রশ্ন : *আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এ-আন্দোলন কতটা প্রভাব ফেলেছে?*

উত্তর : অন্যান্য দেশের ভাষা আন্দোলন বিশেষ দেশটিকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। কানাডা, বেলজিয়াম এবং অন্যান্য বহুভাষী রাষ্ট্রে খুনসুটি লেগেই রয়েছে। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলনের চরম ফল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি ভেঙেই গেল। কিন্তু ভাষা আন্দোলন যেখানে অন্য দেশকে ভাগ করেছে সেখানে বাংলা বাংলাদেশকে এক করেছে। এই আন্দোলন আমাদের সাহিত্য-শিল্প-সংগীত, নাটক-চলচ্চিত্রকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করে। একুশে ফেব্রুয়ারির গান থেকে একুশে মিনারের মধ্যবর্তী বহু শিল্পকর্মের সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের একটা সাক্ষাৎ যোগ রয়েছে।

প্রশ্ন : *দেশে বিপুল সংখ্যায় বই প্রকাশিত হলেও মননশীল বইয়ের সংখ্যা কম। এর কারণ কী?*

উত্তর : একটা আন্দোলনের প্রভাবে বিপুল সংখ্যায় বই প্রকাশিত হচ্ছে—সে তো আনন্দেরই কথা। কোন আবহাওয়ায় এবং কার হাতে সাড়াজাগানো সমৃদ্ধ ও মননশীল বইয়ের জন্ম হয় তা বলা মুশকিল। এর ভেতরে একটা অভবিতব্যতা রয়েছে। আমার আজকের সাড়াজাগানো বই আগামীকাল হয়তো কোনো কম্পনেরই সৃষ্টি করবে না।

প্রশ্ন : *ভাষা আন্দোলনের সবগুলো দাবি কি পূরণ হয়েছে?*

উত্তর : ভাষা আন্দোলনের প্রথম দাবি ছিল বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়। সাংবিধানিকভাবে সেই দাবি চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই আদায় হয়। এখন যে-দাবিটা উঠেছে, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে রাষ্ট্রভাষার প্রচলন, সেটা এখনো পূরণ হয়নি। সেই দাবি করার দায়িত্ব এবং তার জন্য উদ্যোগ ও পরিশ্রম নেয়া দরকার তা আমরা নিইনি।

প্রশ্ন : *ভাষা আন্দোলনের সরকারি গোপন দলিলাদি এখনো প্রকাশ করা হয়নি। এ-সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।*

উত্তর : আমাদের দেশের আর্কাইভস বা সরকারি মহাফেজখানা একটা অনাদরের প্রতিষ্ঠান। আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার সময় তা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। কোনো সরকারপ্রধানের সেই প্রথম পরিদর্শন। আমরা তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে তেমন সোচ্চার নই। সরকারি গোপন বা নাজুক দলিলাদি এখন পর্যন্ত জনসমক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। এ-ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী নাগরিকসমাজ তৎপর হতে পারেন। দেশে বিরাজমান অস্থিরতার জন্য এদিকে আমরা নজর দিইনি।

প্রশ্ন : *বিচারপতি এলিস-এর তদন্ত কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?*

উত্তর : বিচারপতি এলিসের তদন্ত বয়কট করা হয়। আমরা জোরেশোরে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই, কিন্তু বিচারককে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার তদন্তের সময়

সহায়তা দান করি না, সাক্ষী-সাবুদ হাজির করি না। বিচারপতি এলিস বলেছেন, সেদিন ২৭ রাউন্ড গুলি হয় এবং নয়জন হতাহতের মধ্যে চারজন নিহত হন। তাঁর মতে পুলিশের গুলি করা প্রয়োজন ছিল এবং সেই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে গুলি করা ন্যায্য হয়েছিল। তিনি বিস্মিত হন যে, মাথা বাঁচানোর জন্য পুলিশের স্টিল হেলমেট ছিল না, কয়েকটা পুরনো এআরপি হেলমেট ছাড়া। যে-কোনো তদন্তের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। একটু আবেগপূর্ণ ঘটনা কেবল আইন-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে দেখলে সব দেখা হয় না। একজন বিচারকের পক্ষে ঘটনার পেছনের আবেগ বা আদর্শের মূল্যায়ন করা সবসময় সম্ভব হয় না। বিচারক এলিসের তদন্ত বয়কট করার জন্য তাঁর তদন্তফল কতখানি দুষ্ট হয়েছিল তা এই প্রশ্নোত্তরে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : *ভাষা আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমী কি সব উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছে?*

উত্তর : বাংলা একাডেমী যে-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আশানুরূপ পূরণ হয়নি। আসলে অনুবাদকর্মের ওপর এর জোর দেয়া উচিত ছিল। কালক্রমে এটি একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মতো উৎসব ও দিবসপালনে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ এবং অর্থ ব্যয় করে। একাডেমীর কার্যাদি পর্যালোচনার জন্য একটা তদন্ত হওয়া উচিত ছিল বহুদিন আগেই। এ-ধরনের প্রতিষ্ঠানের যথাযথ হিসাব-নিকাশ হয়নি। দশ বছর অন্তর এর মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা দরকার ছিল। নানা বাধাবিপত্তি বিশেষ করে সরকার মহলের অস্থিরতা সত্ত্বেও বাংলা একাডেমীর কাজ বিশেষ অভিধান, অনুবাদে এবং পল্লী তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় বলতে হবে।

প্রশ্ন : *বাংলা উপেক্ষা করে ইংরেজির দিকে ঝুঁকেছেন অভিভাবকরা। এক্ষেত্রে কিছু বাড়াবাড়িও হচ্ছে। এ-ব্যাপারে কিছু বলুন।*

উত্তর : ইংরেজির প্রতি ঝোঁক আজ সারা বিশ্বে। অভিভাবকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তবে যখন তাঁরা তাদের সন্তানসন্ততির সঙ্গে মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলেন না, তখন তাঁরা জানেন না কী ক্ষতি করছেন। ছেলেমেয়েদের বিয়েতে ইংরেজিতে আমন্ত্রণপত্র দেয়ার যে আদেখলামি তাঁরা করছেন তা পরাধীন জাতিসুলভ এবং সম্পূর্ণ আত্মমর্যাদাহীনতার পরিচয় বহন করে। সারা দুনিয়ার ভাষাবিদরা শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য এখনো ইংরেজি প্রায় অপরিহার্য বিধায় অভিভাবকদের তেমন দোষ দিয়ে লাভ নেই।

প্রশ্ন : *বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন।*

উত্তর : বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলা আজ ষষ্ঠ মহাভাষা। আমি অন্যত্র বলেছি আজ বাংলার সূর্য অস্ত যায় না এমন অহংকার আজ আমরা করতে পারি। কিন্তু কেবল সংখ্যার বদৌলতে একটি ভাষা সৌকর্য অর্জন করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

জগদীশ বসু ও সত্যেন বসুর সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক অবদানে আমরা যে-অহংকার করি সেই সঞ্চয় ভাঙিয়ে আমাদের আর চলবে না।

প্রশ্ন : *বর্তমান প্রজন্ম একুশের ঐতিহ্য ও গৌরব সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। এ-সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী?*

উত্তর : আপনি কী ধরনের সংকটের কথা বলছেন আমি বুঝতে পারলাম না। প্রত্যেক সমসাময়িক কাল একটা সংকটকাল এবং সেকালের প্রজন্ম নিজ মেধা ও বুদ্ধিতে সেই সংকটকাল উত্তরণের সমাধান করবে। এ-ব্যাপারে কোনো মেড-ইজি বা সহজ পন্থা নেই।

প্রশ্ন : *একুশের মূল চেতনা আমাদের জাতীয় জীবনে কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে?*

উত্তর : একুশের মূল চেতনা কী? একদিক থেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মূল চেতনার চেয়ে অনেক বেশি আমরা অর্জন করেছি। কিন্তু জীবনের মানোন্নয়নের কথা বললে আমাদের এখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

প্রশ্ন : *অমর একুশের প্রেক্ষাপটে সবার প্রতি আপনার উপদেশ কী?*

উত্তর : কারো প্রতি আমার কোনো উপদেশ নেই। আমার উপদেশের জন্য কেউ কাঙাল নয়। কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। যার যা কাজ তা সুচারুভাবে পালন করলেই একটা দৃষ্টান্ত রাখা যাবে। একদিক থেকে আমাদের তেমন রোল মডেল নেই। আমাদের যে-ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে হচ্ছে সেটার অবসান ঘটিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

আমার দেশ সাক্ষাৎকার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

বিশ্বায়নের রথের তলায়

মহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা ও ইংরেজিতে এ-পর্যন্ত তাঁর ৩৯টি বই বেরিয়েছে। রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্য, আইন ও ভাষার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রজ্ঞা ও সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে অনুবাদগ্রন্থ। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি রেখেছেন স্বকীয় ও উদ্ভাবনী মনীষার স্বাক্ষর। আইন, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নানা বিষয়েই যেন তাঁর অবাধ বিরচণ।

আগরতলায় এসেছেন ২৩তম বইমেলার উদ্বোধক হিসেবে। উপমহাদেশের এই বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ৭৬ বছর বয়স্ক সুসাহিত্যিক শ্রীরহমান কথা বলেন শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক রসিকতা মিশিয়ে। তাঁর চোখেমুখে সদা দীপ্যমান যোগ্য সাহস ও প্রতিজ্ঞা।

ডেইলি দেশের কথা : আগরতলা বইমেলায় আপনার প্রথম আসা, আপনার অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন।

মু. হাবিবুর রহমান : বইমেলার উৎসাহ দেখে আমি আপ্লুত। এমন উৎসাহ দেখে ভালো লাগল। বাংলা ছাড়াও ককবরক ভাষায় এখানে বই বেরোচ্ছে এটা মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিই ভালো লাগল। সিপাহীজলায় গিয়েছিলাম সেখানে এক ককবরকভাষী মহিলার ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্পর্কে সরল এবং আন্তরিক স্বীকারোক্তি শুনলাম। আরও অনেকের সঙ্গেই কথা হয়েছে। গতবছর ত্রিপুরার আইন বিষয়ে একটা কাজে এসেছিলাম। একটা সুন্দর ধারণা নিয়ে যাচ্ছি।

ডেইলি দেশের কথা : মেলার উদ্বোধনী ভাষণে আপনি বই একধরনের প্রেরণা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে বলেছিলেন। একটু খোলাসা করে যদি বলেন।

মু. হাবিবুর রহমান : হ্যাঁ। তবে এ-প্রেরণা কোথা থেকে আসে বলা মুশকিল। প্রেরণা একইসঙ্গে এক অস্থিরতা ও সৃষ্টির জন্ম দেয়। বাংলায় একটা কথা আছে লেখার কিল ভূতে কিলায়। মানুষের এক এক রকমের উদ্দীপনা আসে। যখন উদ্দীপিত বা উৎসাহিত হন তখন তিনি কিছু-একটা সৃষ্টি না করে শান্তি পান না।

ডেইলি দেশের কথা : এ-পর্যন্ত আপনার ৩৯টি বই বেরিয়েছে। আপনার গুরুত্বপূর্ণ পেশার পাশাপাশি লেখালেখিতে কীভাবে এলেন?

মু. হাবিবুর রহমান : মনস্থির করে লেখালেখি করব পরিকল্পনা করে করিনি। বইগুলোও বিভিন্ন বিষয়ের। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে যখনই হোঁচট খেয়েছি তখন পড়াশুনা করে আমার একটা মতামত দাঁড় করিয়েছি।

ডেইলি দেশের কথা : নতুন এই সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে তথ্য প্রযুক্তির উল্লম্ফনের যুগে বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি আজকে যে তির্যক মন্তব্য করলেন—এত আত্মবিশ্বাস, কিসের জোরে বলছিলেন কথাগুলো?

মু. হাবিবুর রহমান : আজকের তথ্যযুগে—মুভি, টিভি ও ইন্টারনেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইয়ের ব্যবসা লাটে উঠতে পারে—নিরাশাবাদীদের এমন দুশ্চিন্তার মুখে ছাই দিয়ে বই সদর্পে টিকে আছে এটাই তো বড় কথা। কম্পিউটার স্ক্রিনে চিকমিকি লেখার চেয়ে সাদা কাগজে কালো আখর যেমন আমাদের নয়ন জুড়ায় এবং মরমে পশে, তার আর তেমন কোনো জুড়ি নেই।

একটা বইকে যেভাবে ব্যবহার করা যায় কম্পিউটারে তা পারবেন না। কম্পিউটার চোখ, শিরদাঁড়া প্রভৃতি অঙ্গের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে। বই আপনি সোফায় বসে, যে-কোনোভাবে বসে বা শুয়েও পড়তে পারবেন।

ডেইলি দেশের কথা : ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের মানুষের ভাষা সংস্কৃতি এক। আবার বৈচিত্র্যও রয়েছে অনেক। দীর্ঘসূত্রী এ-সম্পর্ককে আরও কীভাবে নিবিড় করা যায়?

মু. হাবিবুর রহমান : এখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও নিবিড় হচ্ছে। আর যেখানে ভাষা এক সেখানে সম্পর্ক আরও নিবিড়তর হওয়ার সম্ভাবনা তো থেকেই যায়।

ধর্মবর্ণনির্বিশেষে ত্রিপুরার সকল জাতির মানুষ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে সহায়তা দান করেন তা ভুলবার নয়। এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমসংখ্যা শরণার্থীকে এখানকার মানুষ—এক রাজনৈতিক মহাদুর্যোগের সময় নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা দান করেন। দুর্গত মানুষের প্রতি অনুকম্পায় এই সাহায্য স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বাভাবিক ছিল। যে-জনগোষ্ঠী এত বড় ঝুঁকি নিতে পারেন, তাঁর ঔদার্য, দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতা সকল মানুষের জন্য এক মহা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তবে রাষ্ট্র যখন ভিন্ন হয় তখন দেয়ালও তৈরি হয়। রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে একধরনের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা গড়ে ওঠে। এবং অন্য রাষ্ট্র বা সমাজের সঙ্গে কিছু ব্যবধানও বৃদ্ধি পায়। সমাজ বা ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রের প্রভাব বা প্রতিপত্তিকে ছোট করে দেখা যায় না।

যাতায়াত আরও যত বেশি হবে তত এ ব্যাপারে যাতায়াত বাড়লেও পার্থক্যটা সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে না যেখানে পার্থক্যটা রাষ্ট্রের কারণে।

ডেইলি দেশের কথা : বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীব্যাপী যে-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে তার থেকে উত্তরণের পথ কী?

মু. হাবিবুর রহমান : বিশ্বায়নের রথের তলায় কোনো জনগোষ্ঠী যাতে গুঁড়িয়ে না যায় তার জন্যই আজ মানবাধিকার এবং সংস্কৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্ন উঠছে। কোনো সংস্কৃতি যেন ফসিল বা জীবাশ্মে পরিণত না হয় বা নৃতত্ত্ববিদের কেবল যেন কৌতূহলের বিষয় না হয়।

আমার বিশ্বাস বিশ্বায়নের সাথে নিজ নিজ সংস্কৃতি পার্থক্য কোনোভাবেই মিলিয়ে যাবে না। বিশ্বায়নের প্রবক্তারা চেষ্টা করলেও সবকিছু এক করে নিতে পারবেন না। প্রত্যেক সমাজের সংস্কৃতি বা দৃষ্টিতে এমন কতগুলো স্বকীয়তা আছে যা বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। যেমন ধরুন—ভাষার ক্ষেত্রে যেমন বলা যায় মুমূর্ষু ভাষা, মানে যে-ভাষায় খুব কম লোক কথা বলে তাকেও নিশ্চিহ্ন হতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক ভাষা বাম আঙুলের ছাপের মতো। ভাষায় সৌন্দর্য এবং সৌকর্য ওষুধের অনুপাতের মতো নিরাময় এনে দেয়।

দেশের কথা : আমাদের চারিদিকে এই যে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা এ-সম্পর্কে আপনার মন্তব্য?

মু. হাবিবুর রহমান : রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা জনসাধারণকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্যে ত্রাসের ব্যবহারকে সাধারণত সন্ত্রাস বলা হয়।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের অস্ত্রশস্ত্র ও তহবিলের তদারকি করে কিন্তু পশ্চিমা অস্ত্রব্যবসায়ীরা। এর শেষ কোথায়? রুশ বিপ্লবী ক্রপটিন বলতেন 'শতাব্দীর ইতিহাসের ভিত্তিমূলের উপর যে-ইমারত খাড়া হয়ে আছে তা কি কয়েক কিলো বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করা যাবে?' স্কুলের ছেলেমেয়েদের মতো নিরীহ মানুষ যেভাবে সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে তার এক নিরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

তবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র মূল্যহীন হয়ে যাবে, যদি সন্ত্রাসবাদবিরোধী কোনো হঠকারী তৎপরতায় অসহায় নিরুপায় নিরস্ত্র মানুষের রক্তে সেই অপপ্রয়াস রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

দেশের কথা : অন্যান্য বইয়ের পাশাপাশি আপনার তিনটি কবিতার বই বেরিয়েছে। Death in Crossfire নামের একটি কবিতা বেশ আলোচিত। কবিতায় আপনি কী বলার জন্য লেখেন?

মু. হাবিবুর রহমান : মূল কথা প্রেম, মানবিকতা এবং ভালোবাসা। মানুষই মানুষের শত্রু। অন্য কোনো প্রাণী এমনকি প্রকৃতিও নয়। এটাই আমি কবিতায় বলতে চাই।

দেশের কথা : ত্রিপুরার কোন বিষয়টি আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে?

মু. হাবিবুর রহমান : আমার কাছে এ এক বড় আনন্দের কথা যে ত্রিপুরায় বাংলাভাষী এবং অবাংলাভাষী সকলেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারছে। এমন অঙ্গীকারের জন্য ত্রিপুরার আগরতলা এক প্রশস্ত স্থান। এই যে ভাষণে আমি মাতৃভাষা নিয়ে ককবরকভাষীদের উদ্দেশে ককবরকে পাঠ করলাম তাও আপনি লিখতে পারেন। লিখুন—

ককবরক সানাই তাখুকবুখুকরগ,
সালবা সৌকাং ২১ ফেব্রুয়ারি চুং

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সাল পালাইখা। কাইসা বিগ্রা চাসানা নাই তংনাই দেশনি থানি'খা ওয়ারনা কক অম-ন' আ দেশনি দারাতুই-ন বদরনি সালসা সারা দুনিয়াঅ বরম রুউই পালাইজাগে'। আঙ ককলব বাসাতে কাইসাঅ ২১ ফেব্রুয়ারীন' দুনিয়ানি মজদুর রগনি মে সাল বাই তুলনা রুঅ। মে সাল আহাই-ন ২১ ফেব্রুয়ারীর জত' বরকনি বাগুই। সংচাজাকদ্রপনি সিমি-ন চিনি ভাষা আন্দোলন' কুনু ককন' নাম্লেমা কুরুই। আ জরানি প্রগতিবাদী ওয়ান উানসক্মুং বাই চুং বেং জাকমানি। আফ্রুনি পাকিস্তান্নি জুদা প্রগতিবাদী মত মানিনাইরগ চিনি ভাষানি সংগ্রামে। খা গথকরীঅ। চুং নাইখা দেশনি ২০টা মানি ককনি উন্নতি অংথুং তাই জত-ন জানি জানি মানি কক বাই চেরাই ফুরু পরিউই মানথুং। অম' সতনুই-ন তংথকনা কক ত্রিপুরাঅ বাংলা সানাই তাই বাংলা সায়া জত-ন মানি কক চাই সুরুংমা চেংগুই মানো। 'সাকনি দেশ সাকনি দেশ হো হীন' জত-ন তাখুক অ দেশ নিনি দেশ য়া'—অমতুই খা খামনাই তংমুং কুনু বসংনি বিসিং তা কাসাথু—অমতাই ককনি বাগুই ত্রিপুরানি আগরতলা জাগা কুউার কাইসা। বিশ্বায়নি রথনি তলাঅ কুনু বসং ফেরজাক য়াতুই, বনি বাগুই-ন তিনি মানবাধিকার তাই হুকুমুনি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিরনি কক কাসাঅ। কুনু হুকুম ফসিল এবা মাংথাপ্পা চায়াতুই এবা নৃতত্ত্ববিদ্নি নায়তুকজাগনাই সিমি অংয়াতুই। [ককবরকের অনুবাদকবি শ্যামলাল দেবর্মার সৌজন্যে।]

ডেইলি দেশের কথা আগরতলা, সাক্ষাৎকার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

নির্ঘণ্ট

অ

অলচিকি ৫১
অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী ১১৯
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ৮৮
অধিকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক ২৩, ২৪, ৫৮, ৭০, ৯০

আ

আইনু ৭৪
আগরতলার বইমেলা ৩৮
আতাতুর্ক, কামাল ২২, ৪৯, ৫৬, ৮২
আনান, কফি ৮৯, ১৩
'আন্তর্জাতিক ঘোষণা, ভাষা অধিকার' ৮৫
আন্তর্জাতিক চুক্তি ৮৮, ৩৬
আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস ৮৪
আরবি বর্ণমালা ২১, ৪৯, ৫২, ৫৭
আরবি ভাষা ৫২, ৫৪, ৮৪
আর্কাইভস ১৩০
আহমদ, চৌধুরী, মুনীর উদ্দীন ১০০
আহমদ, তাজউদ্দীন ৯৬
আহমদ, নুবান ৩৬
আহমদ, সৈয়দ ইশতিয়াক ১০৪
আহরাব চৌধুরী ৫৯, ৬১

ই

ইংরেজি ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪৩, ৪৬, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬১১৮, ১২০, ১২১, ১২৫, ১২৬, ১৩১
ইংরেজি পাঠ, সাংবিধানের ৩১, ৩২, ১১১
ইংরেজি, কেরল ২০, ৫৫
ইউনেস্কো ১২, ২৩, ৩৪, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭৫, ৮৯, ৯২, ১২৬, ১২৯
ইউরোপীয় চার্টার ৮০
ইয়াই ৬৯
ইলিচ, ইভান ১১৫
ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল ১০৫
ইসলাম, রফিকুল ১২, ৮৯,
ইহুদি ২১, ৫২, ৫৪

উ

উইলিয়াম, মনিয়ের ৫০
উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষা ৯৩, ১০০, ১০১, ১১২
উত্তরম, স্টিফেন এ ২৩, ৬৭
উপভাষা ১৯, ২০, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭১, ১১৭
উর্দু ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৫১, ৬০, ৬৬, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯৬, ১১১, ১১৮, ১১৯, ১২২, ১২৩
উলফ, লর্ড ১১৩

এ

'একভাষিতা ও বহুভাষিতা' ৭৭
একুশে ফেব্রুয়ারি ১১, ১২, ১৩, ২৪, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪৫, ৬৩, ৬৯, ৭৫, ৮৪, ৮৯, ১০৬, ১২৬, ১২৯,
'একুশে ফেব্রুয়ারির সুবর্ণ জয়ন্তীতে' ১১
'এখন পৃথিবীতে বাংলার সূর্য অস্ত যায় না' ১১৪,
এথনোলোগ ৬৫
এলিস ১২৮, ১৩০, ১৩১

ও

ওয়াইক্লিফ ১১৫
ওয়েলস ভাষা ৭১, ৯০
ওহি ৩৮

ক

কমিউনিস্ট ৯৫
কম্পিউটার প্রিন্টিং ১৭
কম্পিউটার কৌশল ৫১
কস্তারিকা ৯০
কানাডা ১২, ১৯, ২০, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৯, ৯১, ১২৯, ১৩০
কানাডিয়ান চার্টার ২০, ৫৬
কামাল, মোস্তফা ১০১
কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ ৫০
কেচুয়া ২১, ৬৬
কেলটিক ভাষা ৭৩
কোরিয়ান ১৯, ৫৫, ৭৭
ক্রপটিন ১৩৫
ক্রোয়েশিয়ান ২২, ৮৯, ৫৬, ৫৭, ৭২

খ

খান, মোনেম ৬২
খান, লিয়াকত আলী ৬৬, ৯৫

গ

গান্ধী ২৫, ২৬, ২৭, ২৯
গারো ৫১
গুয়ারানি/তৌহলিক ১৯, ৭৯
গ্রিম, ইয়াকুব ৬৪

চ

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র ৯৫
চন্দ্রবিন্দু বিদ্বেষী ৩৭, ৪৬, ১১৭, ১২৭
চাভেস, লিডা ৮২
চীন ১৮, ৩৮, ৫০, ৬৮, ৭৭, ১০৯
চেক ২২, ৫৭
চোমস্কি, নোম ৬৫
চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম ১০০

জ

জব্বার, মোস্তফা ১০৩, ১১০
জাতিবৈরিতা ৫৯, ৬৪
জাতিসংঘ সনদ ৫৮
জাতীয়তাবাদী ৬৬, ৭৭, ৮১
জাপানি ভাষা ১৩, ১১৩
জাপানি ১৯, ৫২, ৫৫, ৬৮, ৭৮, ১১৩, ১১৬
জার্মান ১৮, ১৯, ২০, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৮০, ৮১, ৮৭, ১১৩, ১১৬, ১১৯
জিন্নাহ ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৬৬, ৮২, ৯৫, ১১২, ১২২, ১২৫
জোনস, উইলিয়াম ৫০

ট

টুকানো ৫৯, ৭৯
টয়েনবি, আর্নল্ড ৬৪
ট্রান্স ৫২

ঠ

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৪০, ৪৫, ১১৮, ১৩২

ড

ডায়াক্রিটিক্যাল মার্ক ৫২
ড্যালবি, ডেভিড ৬২, ৬৭, ৭১, ৮৪

প

পদ্মাবতী ৫১
পরভাষা ৫৪, ৫৮, ৭৩, ৭৬, ৮৩, ৯৩, ১০৯, ১১৪, ১১৯
পরিভাষা ১৪, ৩৩, ৩৪, ৯৬, ১০৭, ১১১, ১১৫, ১১৮, ১২৫
পর্তুগিজ ৫০, ১২০
পাকিস্তান ১২, ১৪, ১৫, ২০, ৩১, ৩২, ৪১, ৫০, ৫১, ৫৭, ৬৬, ৮২, ৯৫, ৯৬, ১০২, ১৩০, ১৩৬
পোলিশ ৫৬
প্রকাশক ৩৮, ৩৯
'প্রথমে মাতৃভাষা পরভাষা পরে' ১১৪
পৌন্ড, এজরা ২১, ৩৫, ৮৪

ফ

ফরাসি ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬৮, ৬৯, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৭, ৯০, ৯১, ১১১, ১১৬, ১১৯
ফারসি ২২, ৩১, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৬২, ৯৩, ১১১
ফিশম্যান, জোশুয়া ২২, ২৩
ফ্লেমিশ ৫৫, ৫৬, ৭৮

ত

তাগালোগ ২১, ৬৬
তাজিকিস্তান ২১, ৪৯, ৫৭
তামিল ৫৫, ৫৯, ৮৩
তিরল ৫৭
তুরস্ক ৪৮
তুর্কিভাষা ২২, ৪৯

দ

দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ ৬৬, ৯৫
দেবনাগরী ২৯, ৫১, ৮২

ন

নরওয়ে ২০, ৫৭, ৬৪, ৭৭, ৭৮, ৮৫
নাগরী ২৮, ৫১
নিওমেলানেশিয়া ২১, ৬৬

ব

বই ১৫, ২৭, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৫০, ৫১, ৬৮, ৭১, ১০৩, ১০৬, ১১১, ১১৪, ১১৬, ১২০, ১২৮, ১৩০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫
বম ৫১
বসু, সুভাষচন্দ্র ২৮
বসু, জগদীশচন্দ্র ২৬
বাবেলের টাওয়ার ৭৮
বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বায়ান্নো বছর পরে ৩০
বার্চফিল্ড, রবার্ট ১৮, ৫৫
বাংলা একাডেমী ১৩, ১৪, ১৫, ৩৭, ৬২, ৭৬, ৯৬, ১১৭, ১৩১
বাংলা প্রচলনের আইন
বাংলাভাষী ১১, ৩১, ৩২, ৩৫, ৪১, ৪৬, ৫৩, ৬৩, ১০০, ১৩৬
বাংলা হরফ ৩৮, ৪৮
বিকাইয়া ৭১
বিদ্যাসাগর ৬০
বিপন্ন ভাষা ১৭, ২৩, ৬২, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ১১৯, ১২০
বিপন্ন ভাষার মানচিত্র ২৩, ৬৭
বিভয়ো ৭১
বেলজিয়াম ১২, ১৯, ১৩০
ব্রেত ৯০
ব্রত ৫৩, ৭৪

য

'যবনাধিকার চিহ্ন' ৬০
যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা ১৪

র

রহমান, আতাউর ৩১
রহমান,শেখ মুজিবুর ৩৩, ৯৬, ৯৭
রাখাইন ৫১
রাব্বানী, মোহাম্মদ গোলাম ১০১
রায়, জগদানন্দ ২৬
রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ২৬
রাশিয়ান ৫৫, ৫৬
রাষ্ট্রভাষা ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৭৩, ৭৮, ৮২, ৮৩, ৯৩, ৯৪, ৯৫
রুশ ভাষা ৪৯, ১১৬, ১১৯, ১২০
রুশো ৫৩, ৮৫, ১১৯
রুজভেল্ট, থিওডোর ৫৫, ৬৫, ৮১, ৮২
'রোমান অক্ষর সমাজ' ৫০
রোমান হরফ ১৪, ৫০, ৫১, ৫২
রোমানিয়ান ৫৬

ভ

ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ২৮, ২৯
ভারত ৫৭, ৬২, ৬৬, ৮২
ভাষাসৈনিক ৩৩, ৯৯, ১২২
ভাষা কী ৯৪, ১০৬, ১১৫

ভাষাগত সংখ্যালঘু ২৩, ২৪, ৩৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৬, ৭০, ৭৩, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৯, ৯০, ৯২, ১১৩, ১১৯
ভাষার বয়স ৮৫
ভাষার বানান ৩৭
ভাষা শেখানো ৩৬
ভাষানুগত্য ৫৩
'ভাষা প্রশ্নে জিন্নাহ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ' ২৫
'ভাষাপ্রেম ও ভাষাবৈরিতা' ৫৩, ৫৭, ৮৬
ভাষাবৈরিতা ৩২, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৬৪, ৮৬

ম

মাতৃভাষা ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৫, ৪৯, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৭, ১০০, ১০৯, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩৩, ১৩৬
মাদার টাং ১১৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০, ২১, ৬২, ৬৫, ৬৯, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৭, ৯০, ১২৪
মার্কিন লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস ৫২
মালয় ৫৫
মাহমুদ, রোকনুদ্দিন ১০৪, ১০৭
মুমূর্ষু ভাষা ১৭, ৬৯, ৭৪, ৭৫, ১১৯, ১৩৫
মৃতভাষা ১২০
মে-দিবস ৭৫
মেসিডোনিয়ান ৫৬

ল

লাতিন বর্ণমালা ৪৮, ৪৯
লুপ্ত ভাষা ১১৯, ১২০

শ

শহীদমিনার ১৪
শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ ৭৬
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ ৪৫, ৬০, ৬১
শিক্ষার মাধ্যম ২৫
শ্রীলঙ্কা ৫৭
শূদ্র ২১, ৭৮, ৮৭, ১০০

স

সংখ্যালঘুদের অধিকার, ভাষাগত ২৩, ৫৮, ৬৩, ৭০, ৮১
সংখ্যালঘু চুক্তি ৮৫
সংবিধানের ইংরেজি পাঠ ১১১
সংস্কৃত ১৯, ২১, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৬০, ৬৮, ৭৮, ৮৩, ৮৭, ৯৩, ১১১
'সকল ভাষার জন্য ভালোবাসা' ১৮
সন্ত্রাস ১৩৫
সাঁওতালি ৫১
সামরিক শাসন ১৪, ৫০
সাম্যবাদ ৩০
সার্বো-ক্রোয়েশিয়ান ২২, ৪৯, ৫৬, ৫৭, ৭২
সালাম, আবদুস ৮৯
সিরিলিক হরফ ২১, ২২, ৪৮, ৪৯, ৫৬, ৫৭
সেজ্জর ৬৭
সেন, দীনেশ চন্দ্র ৬০
সোবহান, কে এম ১০৫
স্যাডলার কমিশন ২৫
স্প্যানিশ ১৩, ১৯, ৬৯, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ৯০, ১২০
স্লোভাক ৫৭

হ

হক, কাজী এবাদুর, হক, গাজীউল ১০২
হরফুল কোরআন ৫১
হরফের প্রতিবর্ণীকরণ ৫২
হামদ, নাত ও মাদাহ ৮৪
হিব্রু ১৯, ২১, ৫২, ৫৪, ৬৬, ৭১, ৭৮
হুন ১৮, ৫৪
হায়াকাওয়া ৮২
'হাশমতুল্লাহ বনাম আজমিরিবিবি ৩৩
হাসিনা, শেখ ১৩, ৯৯
হেস্টিংস, ওয়ারেন ৯৩

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET